POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 7

সংখ্যা 33

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 18 আগস্ট, 2022 19 মহররম1444 A.H

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

ক্রেতা ও বিক্রেতা সত্য বললে তাদের কেনাবেচায় বরকত হবে।

২০৭৯) হযরত হাকিম বিন হাজ্জাম (রা.) =এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ে (সওদা ভঙ্গ করার) অধিকার রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি উভয়ে সততা অবলম্বন করে এবং স্পষ্ট কথা বলে তবে উভয়ের ক্রয় ও বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর উভয়ে যদি গোপন করে আর মিথ্যা বলে থাকে, তবে ক্রয় ও বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হবে।

আমন্ত্রিতদের সঙ্গে অনাহুত ব্যক্তি এসে পড়লে করণীয়।

২০৮১) হযরত আবু মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: এক আনসারী আসেন যার ডাকনাম ছিল আবু শোয়েব। সে তার ছেলে কাসাবকে বলল, খাবার তৈরী কর যা পাঁচ জনের জন্য পর্যাপ্ত হবে। কেননা আমি নবী (সা.)-কে আমন্ত্রিত করতে চাই। .... আমি তাঁর (সা.) চেহারা দেখে অনুভব করেছি যে তিনি ক্ষুধার্ত। সে (লোকেদের) আহ্বান করলে তাদের সঙ্গে আরও একজন ব্যক্তিও এসে পড়ে। নবী (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসে পড়েছেন, তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দাও আর যদি চাও সে ফিরে যাক তবে ফিরে যাবে। সে বলল, না, আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়্)

জুমআর খুতবা,১৫ জুলাই ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

কুরআনের জ্ঞান উন্মোচিত হওয়ার জন্য তাকওয়া আবশ্যক। জাগতিক তথা প্রচলিত জ্ঞান অর্জনের জন্য তাকওয়া আবশ্যক নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

বস্তুত আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির উপকরণ আর যে উপায়ে আত্মার প্রকৃত চাহিদা পূর্ণ হয় তা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'লা বলেছেন- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এবং অন্যত্র বলেছেন- لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (আল ওয়াকেয়া: ৮০) 'মুতাহারুন' (পবিত্র) বলতে সেই সব মুত্তাকিদেরকেই বোঝানো হয়েছে যাদের কথা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এর বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে কুরআনের জ্ঞান উন্মোচিত হওয়ার জন্য তাকওয়া আবশ্যক। লোকায়াত জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক তথা প্রচলিত জ্ঞান অর্জনের জন্য তাকওয়া আবশ্যক নয়। ব্যকরণ, পদবিন্যাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য নামায-রোযার বিষয়ে নিয়মানুবর্তী হওয়া, সব সময় খোদা তা'লার বিধিনিষেধ দৃষ্টিপটে রাখা এবং প্রতিটি কথা ও কাজকে খোদা তা'লার আদেশসম্মত করা আবশ্যক নয়, বরং সচরাচর দেখা গেছে যে সাংসারিক জ্ঞানের বিদ্বান ও শিক্ষাথীরা নাস্তিক মানসিকতার হয় এবং তারা সকল প্রকারের পাপাচার ও দুরাচারে লিপ্ত থাকে। বর্তমান জগতের সামনে এক সুস্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে- ইউরোপ ও আমেরিকা। জাগতিক বা গতানুগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা প্রভূত উন্নতি করছে এবং নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে চলেছে, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাজনক। লন্ডনের পার্ক এবং প্যারিসের হোটেলগুলির অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির কথা উল্লেখ করাও দুষ্কর। কিন্তু ঐশী জ্ঞান এবং কুরআনের অন্তর্নিহিত রহস্যবলী সম্পর্কে জানতে গেলে তাকওয়া আবশ্যক। এর জন্য 'প্রকৃত তওবা' দরকার। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ বিনয় ও সংযম সংহকারে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী শিরোধার্য করে এবং তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রমে ভীত হয়ে বিনম্রভাবে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, কুরআনের জ্ঞানের দরজা তার জন্য উন্মোচিত হতে পারে না। এবং আত্মার সেই বৈশিষ্ট্য এবং শক্তিসমূহ বিকশিত হওয়ার উপকরণ কুরআন করীম থেকে আহরণ করতে পারে না যা লাভ করার পর আত্মায় মধ্যে এক প্রকার প্রশান্তি ও সুখানুভব আসে। কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লার কিতাব আর এর অন্তর্নিহিত জ্ঞান খোদার হাতে রয়েছে। অতএব, এরজন্য তাকওয়া হল সিঁড়ি স্বরূপ। সুতরাং, বেইমান, দুষ্ট , অপবিত্র ও জাগতিক কামনা বাসনার হাতে বন্দীরা কিভাবে এর থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে? এর জন্য কোনও একজন মুসলমান, সে যতই ব্যকরণবিদ, সাহিত্যবিষারদ আর বিদ্বান হোক আর জগতের দৃষ্টিতে সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হোক, যদি মুসলমানের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও আত্মশুদ্ধি না করে, তবে কুরআন শরীফের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তাকে কোনও অংশ দেওয়া হয় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪)

'আদল'-এর অর্থ সাম্য। অর্থাৎ মানুষ যেন অন্যের সাথে এমন ব্যবহার করে যেমনটি তার সঙ্গে করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি 'আদল' বা ন্যায় করার অর্থ- যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ন্যায় করেছেন, সেও যেন তাঁর অধিকার প্রদান করে এবং শিরকে লিপ্ত না হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৯১ নং আয়াত

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: কত ছোট এই আয়াতটি, কিন্তু এতে পূর্ণতার দুটি দিক (নেতিবাচক ও ইতিবাচক) কেমন সুন্দরভাবে মিলিত হয়েছে। তিনটি বিষয় অর্থাৎ 'আদল' (সুবিচার), 'এহসান' (উপকার সাধন), এবং 'ইতাইযিল কুরবা' (আত্মীয়-স্বজনকে দান)এর আদেশ করা হয়েছে। আর এই তিনটি কাজ অর্থাৎ 'ফাহাশ' (অশ্লীলতা), 'মুনকার' (মন্দ কাজ), এবং 'বাগইউন'(বিদ্রোহ) থেকে বিরত রাখা হয়েছে। 'আদল'-এর অর্থ সাম্য। অর্থাৎ মানুষ যেন অন্যের সাথে এমন ব্যবহার করে যেমনটি তার সঙ্গে করা হয়। তার প্রতি অন্যায় করা হলে সে ততটুকু প্রতিশোধ নিতে পারে যতটুকু অন্যায় তার প্রতি হয়েছে। কিন্তু তার থেকে বেশি কঠোরতা সে করতে পারে না। যদি কোনও ব্যক্তি তার উপকার সাধন করে, তবে অন্তত পক্ষে ততটুকু উপকার করা তার কর্তব্য হিসেবে বর্তায়।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি 'আদল' বা ন্যায় করার অর্থ- যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ন্যায় করেছেন, সেও যেন তাঁর অধিকার প্রদান করে আর নিজের সত্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার জন্য আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ যেন না তৈরী করে। অনুরূপভাবে তাঁর এই অধিকার যেন আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া অন্য কাউকে না দেয় আর শিরকে লিপ্ত না হয়। কেননা শিরক করা খোদা তা'লার অধিকার ছিনিয়ে অন্য কাউকে দেওয়ার নামান্তর। আর এটা অন্যায়।

এরপর শেষের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(ট্যাটু বা উল্কি তৈরীর বিষয়টির উত্তরের শেষাংশ)

অতএব, যে সৌন্দর্য লাভের জন্য অভিসম্পাতের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয় তার অর্থ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। তাই আমরা যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই হাদীসগুলির বিষয় নিয়ে প্রণিধান করি, তখন দেখতে পাই যে এই বিষয়গুলি নিষেধ করার পাশাপাশি হুযুর (সা.) এও বলেছেন যে বনী ইসরাইল জাতি সেই সময় ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের মহিলারা এই ধরণের কাজ করতে শুরু করে। হুযুর (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় ইহুদীদের মধ্যে অশ্লীলতা সাধারণ বিষয় ছিল আর মদিনায় একাধিক পতিতালয় ছিল যেখানে থাকা মহিলারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করত। এই কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর এই কাজগুলির কদর্যতা বর্ণনা করে মোমেন মহিলাদেরকে সেই সময় এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব, এই বিষয়গুলি নিষিদ্ধ করার পেছনে বাহ্যত এই প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় যে এগুলির পরিণামে মানুষ যদি বাহ্যিক পরিপাটিতে এই ধরণের কৃত্রিম পরিবর্তন আসে যার ফলে পুরুষ ও নারীর মাঝেকার খোদা সৃষ্ট পার্থক্য মুছে যায় বা এই ধরণের ক্রিয়াকলাপের কারণে শিরক-এর প্রতি আকর্ষণ তৈরী হওয়ার আশঙ্কা থাকে- যা সব থেকে বড় পাপ, কিম্বা এমন কাজ সম্পাদিত হয় যার ফলে নিজের বিপরীত লিঙ্গারা অবৈধভাবে আকৃষ্ট হয়- তবে এই সব কাজগুলি অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

অতএব, উল্কি আঁকার ক্ষেত্রে পুরুষ হোক বা মহিলা তাদের একটাই উদ্দেশ্য থাকে-প্রদর্শন এবং নিজের বিপরীত লিঙ্গকে অবৈধভাবে আকৃষ্ট করা। এই কারণেই মানুষ সাধারণত শরীরের সেই অংশে উল্কি বানায় যেগুলিকে সচরাচর মানুষ উন্মুক্ত রেখে প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি শরীরের আবৃত অঙ্গে উল্কি বানায় তবে তার পিছনেও এই চিন্তাধারা থাকে। অর্থাৎ কুকর্ম বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার সময় বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সামনে গোপন অঙ্গে তৈরী হওয়া প্রদর্শন করা যায়। এই উভয় পন্থাই ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী হওয়ার কারণে অবৈধ বলে বিবেচিত।

এছাড়া ট্যাটু বা উল্কির একাধিক বাহ্যিক ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। শরীরের যে অংশে ট্যাটু করা হয়, সেখানকার ত্বকের নীচের ঘর্মগ্রন্থীগুলির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে আর ট্যাটু তৈরী করা শরীরের সেই অংশ থেকে ঘাম নিঃসরণ হ্রাস পায় যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অনুরূপভাবে কিছু কিছু ট্যাটু শরীরের স্থায়ী অংশে পরিণত হয় তাই শরীরের বৃদ্ধি বা সংকোচনের সাথে ট্যাটুর আকারও পরিবর্তিত হতে থাকে, যার ফলে ট্যাটু সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিবর্তে কদর্য রূপ ধারণ করে আর তখন অনেকের কাছে ট্যাটু অসহনীয় হয়ে ওঠে কিন্তু তা থেকে নিস্তার পাওয়া আর সম্ভব হয় না। অতএব, এই সব কারণেও ট্যাটু তৈরী করা এক প্রকার বাজে কাজ।

আর যতদূর মহিলাদের নিজেদের বৈধ এবং ইসলামী সীমার মধ্যে থেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রু উপড়ে ফেলার প্রসঙ্গটি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে বলতে হয় যে হুযুর (সা.) সেই যুগে এই সব ক্ষতিকর দিক পরিদৃষ্টে মোমেন মহিলাদেরকে এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি কোনও কোনও অসুবিধা বা রোগব্যধির কারণে বিষয়টির ব্যতিক্রমও রেখেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) -এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি মহিলাদেরকে সিং দিয়ে চুল তুলে ফেলা, দাঁতকে তীক্ষ্ণ করা, নকল চুল লাগানো এবং শরীরে উল্কি দেওয়ার বিষয়ে হুযুর (সা.) কে নিষেধ করতে শুনেছি। তবে যদি কোনও ব্যধি থাকে, সেক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে।

ইসলামের মতে, কর্মের ফলাফল নীয়্যত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই এই যুগে পর্দার ইসলামী আদেশ মেনে যদি কোনও মহিলা বৈধ পন্থায় এবং বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব বিষয় থেকে উপকৃত হয় তবে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু যদি এই সব কাজের পরিণামে কোনও পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয় বা কোনও শিরকপূর্ণ প্রথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বা ইসলামের কোনও সুস্পষ্ট আদেশের উলঙ্ঘন হয়, যেমন এই যুগেও মহিলারা যদি নিজেদের পরিচ্ছন্নতা বা ওয়াকসিং করানোর সময় পর্দাকে আবশ্যক না করে আর অন্যান্য মহিলাদের সামনে তাদের গোপনাঙ্গ পর্দাহীন হয়, তবে এই কাজ হুযুর (সা.)-এর এই সতর্কবাণীর আওতায় পড়বে আর এর অনুমতি নেই।

এছাড়া এই প্রসঙ্গে একথাও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা ফিতনা-ফাসাদকে হত্যার চাইতেও বড় অপরাধ আখ্যায়িত করে তা প্রতিহত করার আদেশ করেছেন। আর এমন কিছু দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে বা বিয়ের পর তালাক হয়ে গেছে। কারণ,পুরুষ জানতে পেরেছে স্ত্রীর মুখে রোম রয়েছে। যদি সামান্য কয়েকটা রোম পরিষ্কার না করা হয় বা উপড়ে ফেলা না হয় তবে আরও সংসার ভেঙ্গে যাবে। অপছন্দের এক দীর্ঘ ধারা শুরু হয়ে যাবে। আর এই আদেশে আঁ হযরত (সা.)-এর উদ্দেশ্য নিশ্চয় এমন হতে পারে না যে সমাজে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক যার পরিণামে সংসারে অশান্তি ছড়ায়। এমন কঠিন শব্দ ব্যবহারের পেছনে যে প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় তা এই যে, শিরক হল সব থেকে বড় পাপ আর এগুলো যেহেতু দেবদেবীর কারণে ধারণ করা হয় বা এগুলোর পরিণামে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়, তাই তিনি (সা.) কঠিন শব্দ ব্যবহার করে নিজের ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন এবং এভাবে শিরকপূর্ণ রীতি এবং অশ্লীলতাকে নির্মূল করেছেন।

(নোট: উপরোক্ত উত্তরের কিয়দাংশ পূর্বেও বিভিন্ন পর্বে কিছু প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানে পূর্ণাঙ্গ উত্তর প্রকাশিত হল)

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারকে Short Selling বৈধ বা অবৈধ হওয়ার বিষয়ে জানতে চান। হুযুর আনোয়ার ২০২১ সালের ১৬ই মে তারিখে এর উত্তরে বলেন: আসলে Short Selling হল দ্রুত অর্থ উপার্জনের সহজ পদ্ধতি, যে প্রক্রিয়ায় শেয়ার ধারকরা ব্রোকাদের থেকে কিছু শেয়ার ধার হিসেবে নিয়ে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দেয় আর সেই শেয়ার সস্তা হলে তা বাজার থেকে কিনে ব্রোকারকে ফেরত দেয়। এই প্রক্রিয়ায় লভ্যাংশের কিছুটা ব্রোকারকে কমিশন হিসেবে দেয় আর কিছু অংশ শেয়ার বিক্রয়কারী লাভ হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসলাম যেভাবে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি ব্যবসা বাণিয্যের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট এবং সহজ সরল পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছে। আঁ হযরত (সা.) ব্যবসায়িক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন- 'যদি তোমাদের পণ্যে কোনও ত্রুটি থাকে তবে তা গোপন করো না, বরং স্পষ্টভাবে গ্রাহককে জানিয়ে দাও। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)। পরিমাপ সঠিক রেখো, মাপে কম দিবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রয় করা পণ্য নিজের দখলে না পাও সেটি আগে বিক্রি করো না। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু)।

অতএব প্রতিটি ব্যবসা ভালভাবে যাচাই করে করা উচিত যাতে মানুষ নিজেও যেন ধোকা না খায় আর অন্যকেও ধোকা না দেয়। Short Selling এর ব্যবসায় কোম্পানি স্তরেও এবং ব্যক্তিগত স্তরেও গ্রাহককে ধোকা দেওয়া হয়ে থাকে আর যে সব শেয়ারের দাম পতনের দিকে থাকে সেগুলিকে এই উদ্দেশ্যে বিক্রী করে দেওয়া হয় যে কিছু দিন পর সেগুলির দাম কমে গেলে সস্তায় কিনে আসল মালিককে শেয়ার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ একথা জানা সত্ত্বেও যে শেয়ারের দামে কিছু দিনের মধ্যে পতন হতে চলেছে, গ্রাহককে অন্ধকারে রেখে তাকে এই শেয়ার বিক্রী করে দেওয়া হয়।

এছাড়াও স্টক মার্কেট হওয়া বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে Short Selling এক প্রকার জুয়াই বটে। এই কারণে অনেক সময় Short Selling

লাভ হওয়ার পরিবর্তে অনেক বড় লোকসানও হয়। যেমন কিছু সময় পূর্বে Game Stopএর শেয়ারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

অতএব ইসলামি শিক্ষার আলোকে একজন মোমেন ব্যবসায়ির দায়িত্ব হল নিজেও প্রতারিত না হওয়া এবং অপরকেও প্রতারিত না করা। বরং নির্বিবাদ ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করা এবং স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখা।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)**

জুমআর খুতবা

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কর্মপন্থা ও হাদীসের আলোকে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র নবুয়্যতের দাবি করার কারণে মহানবী (সা.)ও কখনো (শাস্তিমূলক) পদক্ষেপ নেন নি, আর হযরত আবু বকর (রা.)'র এসব যুদ্ধাভিযানও শুধুমাত্র এ কারণে ছিল না যে, নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদারদের নির্মূল করা হোক; বরং মূল কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৫ জুলাই , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১৫ওয়াফা, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুসলামানদের গৃহীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা চলছে। এ সম্পর্কে হযরত মুহাজির এবং হযরত ইকরামা (রা.)'র কিন্দা ও হাযারা মওত অঞ্চলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল তাতে আরো যাকিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা হল, সানায় যখন হযরত মুহাজির(রা.)'র স্থিতি লাভ হয়, অর্থাৎ অবস্থান দৃঢ় হয়ে যায় তখন তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে পত্র মারফত নিজের সমস্ত কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকেন। এমন সময় হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং ইয়ামেনে অন্য যে সব শাসক মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে শাসন করছিলেন তারা হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে পত্র প্রেরণ করে মদিনায় ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং তাঁর সাথে অন্যান্য শাসককে ইয়েমেনে থাকার বা মদিনায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তবে শর্ত দেন, নিজের স্থলে অন্য কাউকে নিযুক্ত করে আসতে হবে। সিদ্ধান্তে র স্বাধীনতা পাওয়ার পর সবাই ফিরে আসেন। তখন হযরত মুহাজির এ নির্দেশ প্রাপ্ত হন যে, ইকরামার সাথে যোগ দাও দুজনে মিলে হাযারা মওতে উপস্থিত হয়ে যিয়াদ বিন লাবীকে সঙ্গ দাও। এছাড়া [হযরত আবু বকর (রা.)] তাঁকে তার স্বপদে বহাল রেখে এ নির্দেশ দেন যে, তোমার সাথে যুক্ত হয়ে যারা মাক্কা ও ইয়ামেনের মধ্যবতী অঞ্চলে জেহাদ করেছে তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দাও। ফিরে আসতে চাইলে আসতে পার কিন্তু জিহাদে অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিবে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়্যত অউর কানামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩০৫)

লোকেরা নিজেই বলুক, আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই।

হযরত ইকরামা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র পক্ষ থেকে পত্র প্রাপ্ত হন তাতে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সানা থেকে আগত মুহাজির বিন আবু উমাইয়ার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ কর এবং দুজনে মিলে কিন্দা অভিমুখে অগ্রসর হও। এই পত্র পাওয়ার পর হযরত ইকরামা মাহ্ রা থেকে বের হয়ে আবইয়ানে যাত্রা বিরতি দিয়েমুহাজির বিন আবু উমাইয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আবইয়ানও ইয়ামেনের একটি জনবসতির নাম। (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩০৫)

কিন্দা গোত্রের মুরতাদদের বিরুদ্ধে কার্যক্রমপ্রসঙ্গে তাবরির ইতিহাস গ্রন্থে লিখা আছে, মুরতাদ হওয়ার পূর্বে কিন্দা ও হাযারা মওতের সমগ্র অঞ্চলের (মানুষ) যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তখন তাদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, হাযারা মওতের কিছু লোকের যাকাত কিন্দাতে জমা করবে এবং কতক কিন্দাবাসীর যাকাত হাযারা মওতে সমবেত করবে। অর্থাৎ সেখানে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ যেন পরস্পরের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া হাযারা মওতের অধিবাসীদের কারো কারো যাকাত সকুনে এবং সকুনবাসী কারো কারো যাকাত হাযারা মওতে জমা করবে। এ প্রে ক্ষিতে কিন্দার কিছু লোক বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের কাছে উট নেই আপনি যদি সঙ্গত মনে করেন তাহলে তারা আমাদের কাছে যাকাতের অর্থসম্পদ বাহনে করে পৌঁছে দিলে ভাল হয়। একথা শুনে মহানবী (সা.) তাদেরকে, অর্থাৎ হাযারা মওতের অধিবাসীদের বলেন, তোমাদের পক্ষে এটি করা সম্ভব হলে তোমরা এমনটি করো। তারা উত্তর দেয়, আমরা দেখব, তাদের কাছে যদি (বাহনের জন্য) পশু না থাকে তাহলে আমরা এমনটি করব। কিন্তু এরপর মহনবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং যাকাত প্রদানের সময় হয় তখন লোকদেরকে যিয়াদ নিজের কাছে আসতে বললে তার কাছে আসে আর বনু ওয়ালীয়া, অর্থাৎ কিন্দাবাসী বলে, যেভাবে তোমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলে সে অনুসারে যাকাতের অর্থসম্পদ আমাদের কাছে পৌঁছে দাও। তখন তিনি বলেন, তোমাদের কাছে তো ভারবাহী পশু রয়েছে, তোমরা তোমাদের পশু নিয়ে এসে তোমাদের যাকাতের অর্থসম্পদ নিয়ে যাও। তিনি নিজে যাকাত পৌঁছে দিতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু কিন্দা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। এরপর তারা নিজ নিজ গৃহে চলে যায়। তাদের আচরণ নড়বড়ে হয়ে যায়। এক পা আগে বাড়ালে আরেক পা পিছিয়ে যেতো আর যিয়াদ মুহাজেরের প্রতীক্ষায় তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকেন, অর্থাৎ যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি যাতে অর্থাৎ হযরত মুহাজির মুহাজেরের আসার অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুহাজির এবং হযরত ইকরামা (রা.)কে এই পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমরা দুজন হাযারা মওতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও এবং যিয়াদকে তার দায়িত্বে বহাল রাখবে। মক্কা থেকে ইয়েমেনের মধ্যবতী অঞ্চলের যেসব লোক তোমাদের সাথে আছে তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দাও, কেবল তারা ছাড়া যারা সানন্দে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়। এছাড়া উবায়দা বিন সা'দকে যিয়াদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দাও। সে অনুসারে হযরত মুহাজির (রা.) এই নির্দেশের ওপর আমল করেন। তিনি সানআ থেকে হাযারা মওতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং ইকরামা আবইয়ান থেকে হাযার মওতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন আর মাআরেব নামক স্থানে উভয়ে মিলিত হন। তারা উভয়ে সুহায়েদ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে হাযারা মওতে পৌঁছেন। কিন্দা (গোত্র) যখন হযরত যিয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফেরত যায় তখন হযরত যিয়াদ বনু আমরের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্দার এক যুবক ভুলবশত তার ভাইয়ের একটি উঁটনী যাকাতের উঁট হিসেবে দিয়ে দেয়। হযরত যিয়াদ সেটির গায়ে আগুন দিয়ে দাগিয়ে অর্থাৎ মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয় যে, এটি বায়তুল মাল বা যাকাতের সম্পদ। সেই ছেলে যখন উঁট পাল্টে দেওয়ার জন্য বলে যে, ভুলে এটি হয়ে গিয়েছিল তখন হযরত যিয়াদ মনে করেন সে অজুহাত দেখাচ্ছে। সে কারণে তিনি তাতে রাজি হন নি। ফলে সে তখন তার গোত্রের লোকদের এবং আবু সুমায়েদকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়, অর্থাৎ যে উঁটনী দিয়েছিল সে। আবু সুমায়েদ যখন হযরত যিয়াদের কাছে উঁটনী পাল্টে দেওয়ার দাবি করে তখন হযরত যিয়াদ তার অবস্থানে অটল থাকেন। আবু সুমায়েদ রেগে গিয়ে জোর করে উঁটনীর বাঁধন খুলে দেয় যার ফলে হযরত যিয়াদের সঙ্গীরা আবু সুমায়েদ ও তার সাথিদে বন্দী করে এবং উঁটনীও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তারা পরস্পরের সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করে। অতঃপর বনু মুআবিয়া আবু সুমায়েদকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্দা গোত্রেরই দুই শাখার একটি

হলোবনু হারেস আর বনু আমর বিন মুআবিয়া হলো অপরটি। তারা হযরত যিয়াদের কাছে নিজ সাথিদের মুক্তির দাবি জানায়, কিন্তু হযরত যিয়াদ তাদের চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, এভাবে নয় বরং তোমরা চলে যাও, তারপর আমি দেখব। তাদের না যাওয়ার কারণে হযরত যিয়াদ তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের অনেক মানুষকে হত্যা করে আর কিছু মানুষ সেখান থেকে পলায়ন করে। হযরত যিয়াদ ফেরত এসে তাদের বন্দিদের মুক্ত করে দেন, কিন্তু তারা ফিরে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। ফলে বনু আমর, বনু হারেস ও আশআস বিন কায়েস এবং সিম্ত বিন আসওয়াদ নিজ নিজ বুহ্যে চলে যায় আর যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে হযরত যিয়াদ সৈন্য একত্রিত করে বনু আমরের ওপর আক্রমণ করলে তাদের অনেক মানুষ মারা যায় আর যারা পালিয়ে যেতে পেরেছে তারা পালিয়ে যায়। হযরত যিয়াদএকটি বিশাল সংখ্যাকে বন্দি করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। পথিমধ্যে আশআস এবং বনু হারেসের লোকেরা আক্রমণ করে মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের বন্দিদের ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনার পর চতুর্দিকের বিভিন্ন গোত্রও তাদের সাথে মিলিত হয় এবং তারাও প্রকাশ্যে মুরতাদ হবার ঘোষণা দেয়। একারণে হযরত যিয়াদ সাহায্য চেয়ে হযরত মুহাজিরের নিকট পত্র লিখেন। হযরত মুহাজির হযরত ইকরামাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং নিজে সঙ্গিদের সাথে নিয়ে কিন্দা গোত্রের ওপর আক্রমণ করেন। কিন্দার লোকেরা পালিয়ে নুজায়ের নামক তাদের এক দুর্গে আশ্রয় নেয়। এটিও হাযারা মওতের নিকটবর্তী ইয়েমেনের একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গের তিনটি রাস্তা ছিল। একটি পথে হযরত যিয়াদ অবতরণ করেন, দ্বিতীয় পথে হযরত মুহাজির শিবির স্থাপন করেন এবং তৃতীয় রাস্তাটি কিন্দার নিয়ন্ত্রণে ছিল। এক পর্যায়ে হযরত ইকরামা সেখানে পৌঁছে যান এবং সেটির দখল নিয়ে নেন। হযরত যিয়াদ এবং হযরত মুহাজির(রা.)'র সেনাবাহিনীতে পাঁচ হাজার মুহাজির ও আনসার সাহাবা এবং বিভিন্ন গোত্রের লোক ছিল। নুজায়ের দুর্গে অবরুদ্ধ লোকেরা যখন দেখতে পায়, মুসলমানরা লাগাতার সাহায্য পাচ্ছে তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। এজন্য তাদের নেতা আশআস তৎক্ষণাৎ হযরত ইকরামা (রা.)'র নিকট পৌঁছে নিরাপত্তা প্রার্থী হয়। হযরত ইকরামা (রা.) আশআ'সকে নিয়ে হযরত মুহাজির (রা.)'র নিকট আসেন। আশআ'স তার নিজের এবং তার সাথের নয়জন ব্যক্তির জন্য এই শর্তে নিরাপত্তা প্রর্থনা করে যে, সে মুসলমানদের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দিবে। হযরত মুহাজির এই শর্ত মেনে নেন। আশআ'স নয়জন ব্যক্তির নাম লিখার সময় তাড়াহুড়া ও ভয়ের কারণে নিজের নামই লিখতে ভুলে যায়। এরপর সে হযরত লিখিত চুক্তিনামা মুহাজির(রা.)'র নিকট নিয়ে যায়। সেটিতে তিনি (রা.) মোহরাঙ্কিত করেন বা সিল মেরে দেন। এরপর আশআ'স ফিরে গিয়ে দুর্গের দরজা খুলে দিলে মুসলমানরা তাতে প্রবেশ করে। উভয় পক্ষের যুদ্ধে সাতশ' কিন্দিকে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ, দুর্গের লোকেরা(ও) মোকাবিলা করে এবং যুদ্ধ করে। যাহোক, তাদের লোকদের হত্যা করা হয় এবং এক হাজার মহিলাকে বন্দি করা হয়। এরপর হযরত মুহাজির নিরাপত্তা পত্র আনান এবং এতে উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এতে আশআ'সের নাম ছিল না, তাই হযরত মুহাজির (রা.) তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু হযরত ইকরামা (রা.)'র অনুরোধে তাকে অন্য বন্দিদের সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে পাঠিয়ে দেন, যাতে এর সম্পর্কেও হযরত আবু বকর (রা.)ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলমানরা যখন বিজয়ের সংবাদ এবং বন্দিদের নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র সকাশে উপস্থিত হন তখন তিনি (রা.) আশআ'সকে ডেকে এনে বলেন, তুমি বনু ওলিয়্যার প্রতারণার শিকার হয়েছ আর তারা এমন নয় যে, তুমি তাদেরকে ধোঁকা দিতে পার আর তারাও তোমাকে এ কাজের যোগ্য মনে করত না। তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে আর তোমাকেও ধ্বংস করেছে। তুমি কি এতে ভীত নও যে, তুমি মহানবী (সা.)-এর বদ-দোয়ার শিকার হবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্দা গোত্রের চার নেতার প্রতি মহানবী (সা.) অভিসম্পাত করেছিলেন যারা আশআ'সের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কী মনে কর? আমি তোমার সাথে কী ব্যবহার করব? আশআ'স বলে, আপনার মতামত কি তা আমি জানি না। (তখন) হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার মতে তোমাকে হত্যা করা উচিত। তখন সে বলে, আমি সেই ব্যক্তি যে স্বগোত্রীয় দশজন মানুষের প্রাণভিক্ষার চুক্তি করিয়েছে, আমাকে হত্যা (করা) কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানরা কি বিষয়টি (অর্থাৎ তালিকা দেওয়ার) দায়িত্ব তোমার হাতে দিয়েছিল? সে বলে, জী হ্যাঁ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, বিষয়টি যখন তোমার দায়িত্বে দিয়েছিল আর তুমি তাদের কাছে (তালিকা নিয়ে) এসেছিলে তখন কি তারা তাতে মোহরাঙ্কিত করেছিল বা সত্যায়ন করেছিল? সে বলে, জী হ্যাঁ! তখন তিনি (রা.) বলেন, লিখিত চুক্তি (তালিকা) সত্যায়ন করার পর সে অনুসারে চুক্তি কার্যকর করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এর পূর্বে তুমি শুধু আপোষমীমাংসার আলোচনা করছিলে। আশআ'স যখন (এই) ভয় পায় যে,তার মৃত্যু অনিবার্য তখন সে নিবেদন করে, আপনি যদি আমার কাছ থেকে কোন মঙ্গালের প্রত্যাশা করেন তাহলে এই বন্দিদের মুক্ত করে দিন আর আমার সকল দুর্বলতা ক্ষমা করুন এবং আমার ইসলাম কবুল করুন। এছাড়া আমার সাথে সেই ব্যবহারই করুন যা আপনি আমার মত লোকদের সাথে করে থাকেন। আর আমার স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। লেখা আছে- এ ঘটনার পূর্বে আশআ'স একবার মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র বোন উম্মে ফারওয়া বিনতে আবু কোহাফাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। হযরত আবু কোহাফা নিজ কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। রুখসাতানা বা কন্যাদানের বিষয়টি আশআ'সের পরের যাত্রার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, পরের বার এলে কন্যাদান করা হবে। জনৈক লেখক হযরত উম্মে ফারওয়াকে হযরত আবু বকর (রা.)'র কন্যা আখ্যা দিয়েছেন।

যাহোক, পরে মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন আর আশআ'স মুরতাদ ও বিদ্রোহী হয়ে যায়। তাই তার সন্দেহ হয়, হয়ত তার স্ত্রীকে তার কাছে তুলে দেওয়া হবে না। আশআ'স হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট নিবেদন করে, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবায় আপনার অঞ্চলের সর্বোত্তম লোকদের মাঝে পাবেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার প্রাণ ভিক্ষা দেন এবং তার ইসলাম কবুল করেন এবং তার স্ত্রীকে তার হাতে তুলে দেন। অধিকন্তু বলেন, যাও; তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যেন কল্যাণকর সংবাদই আসে।

এভাবেই হযরত আবু বকর (রা.) সকল বন্দিকেও মুক্ত করে দেন এবং তারা নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যায়।

(তারিখুত তাবারী,২য় খণ্ড, পৃ: ৩০০-৩০৪) (হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল-পৃ: ২৪০) (জুমহেরাতু ইনসাবিল আরব, পৃ: ৪২৫) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৫৩৭-৫৩৮) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড,পৃ: ১০৯) (মুজামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১৫) (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৭৫-৫৭৬) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮-৯)

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে নিজ গোত্রের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আশআ'স নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে, আর বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের পর সে উম্মে ফারওয়ার সাথে মদীনাতেই বসবাস করেন। হযরত উমরের (রা.)'র যুগে যখন ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন সে-ও ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে ইরানী ও রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেকারণে মানুষের দৃষ্টিতে তার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে তার হারানো সম্মান ফিরে পায়। মোটকথা, পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হযরত মুহাজির ও হযরত ইকরামা (রা.) হাযার মওত ওকিন্দাতেই অবস্থান করেন।

মুরতাদ বিদ্রোহীদের সাথে এগুলো ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল যার পরে আরবে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায় এবং সকল গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে।

হযরত মুহাজির (রা.) ঐ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সকল উপাদান সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে সেরূপ কঠোরতার সাথে কাজ করেন যেমনটি তিনি ইয়েমেনে করেছিলেন।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৪১)

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুহাজির (রা.)-কে ইয়েমেন ও হাযার মওত এর মধ্য থেকে যে কোন একটি অঞ্চলকে নির্বাচন করার জন্য লিখলে তিনি ইয়েমেনকে নির্বাচন করেন আর এভাবে ইয়েমেনে দু'জন আমীর নিযুক্ত হন।

হযরত আবু বকর (রা.) মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কর্ম রত গভর্নরদের লিখেন যে,পর সমাচার, আমার মতে অধিক পছন্দনীয় বিষয় হলো; আপনারা রাষ্ট্রপরিচালনায় শুধুমাত্র সেসব লোককেই অন্তর্ভুক্ত করুন যারা বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের কালিমা থেকে মুক্ত ছিল। (যদিও তারা এখন

ফিরে এসেছে, কিন্তু এটা দেখুন যে, এদের মাঝে তারা নেই তো যারা ইতিপূর্বে ধর্মত্যাগ করেছিল অথবা বিদ্রোহ করেছিল।) এরপর তিনি (রা.) বলেন, আপনারা সবাই এর ওপর আমল করুন এবং এই (নীতিই) অবলম্বন করুন। সেনাবাহিনী থেকে যারা ফেরত আসতে চায় তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দিন আর শত্রুদের সাথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোন ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীর সাহায্য গ্রহণ করবেন না। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫)

অধিকাংশ লেখক আর বিশেষভাবে এ যুগের জীবনীকারকরা সাধারণত হযরত আবু বকর (রা.)'র এসব যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, যারা নবুয়্যতের মিথ্যা দাবি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে এসব জিহাদ করা হয়েছিল; আর তরবারির জোরে নির্মূল করা হয়েছে। কেননা, এটাই তাদের জন্য শরীয়তসম্মত শাস্তি ছিল। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়নকারী কখনোই এ কথার সমর্থন করতে পারে না। যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কর্মপন্থা ও হাদীসের আলোকে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র নবুয়্যতের দাবি করার কারণে মহানবী (সা.)ও কখনো (শাস্তিমূলক) পদক্ষেপ নেন নি, আর হযরত আবু বকর (রা.)'র এসব যুদ্ধাভিযানও শুধুমাত্র এ কারণে ছিল না যে, নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদারদের নির্মূল করা হোক; বরং মূল কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ।

অতএব, এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে যে, সাহাবীরা কেন নবুয়্যতের দাবীদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মওলানা মওদুদী সাহেবের একথা লেখা যে, সাহাবীরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা মহানবী (সা.)-এর পরে নবুয়্যতের দাবি করেছিল, এটি সাহাবীদের বক্তব্য পরিপন্থী।

মওলানা মওদুদী সাহেবের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, (এটি তার জীবদ্দশার কথা) মহানবী (সা.)-এর পর যারা নবুয়্যতের দাবি করেছিল এবং সাহাবীরা যাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তারা সবাই এমন (মানুষ) ছিল যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, মওলানা সাহেবের ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নেরবড় বড় দাবি রয়েছে, (কিন্তু) আক্ষেপ! তিনি যদি এ বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশের পূর্বে ইসলামী ইতিহাস পাঠ করে দেখতেন তাহলে তিনি জানতে পারতেন, মুসায়লামা কায্যাব, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ্ বিনতে হারেছ ও তুলায়হা বিন খুওয়াইলেদ আসাদী- এরা সবাই এমন মানুষ ছিল যারা মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে নিজেদের সরকারের ঘোষণা দিয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, মওলানা সাহেব যদি মনোযোগ দিয়েতারীখ ইবনে খলদুনপাঠ করতেন তাহলে এটি স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, তার অর্থাৎ, মওলানা সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি (সম্পূর্ণ) ভুল। অতএব, সেখানে লিখিত আছে; গোটা আরববাসী, তা সাধারণ হোক বা বিশেষ শ্রেণির, তাদের ধর্মত্যাগের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। কেবলমাত্র কুরাইশ ও সাকীফ- এ দু'টি গোত্র ছিল যারা ধর্মত্যাগ থেকে মুক্ত ছিল। আর মুসায়লামার বিষয়টি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তায়ে ও আসাদ গোত্র তুলায়হা বিন খুওয়াইলেদের আনুগত্য বরণ করে নেয়। এছাড়া গাতফান গোত্রও মুরতাদ হয়ে যায়। আর হাওয়াযেন গোত্র যাকাত আটকে রাখে। অপরদিকে বনু সুলায়েমের নেতারাও মুরতাদ হয়ে যায়। আর মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত আমীরগণ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বনু আসাদ ও অন্যান্য বিভিন্ন এলাকা ও শহর থেকে ফিরে আসে আর তারা বলে, আরবের ছোট বড় সবাই আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) অপেক্ষা করেন যে, উসামা ফিরে আসলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। কিন্তু আবাস ও যুবইয়ানের গোত্রগুলো তাড়াহুড়ো করে এবং মদীনার নিকটবর্তী আবরাক নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করে। আর অন্যান্য আরও কিছু মানুষ যুল কাস্সাতে এসে শিবির স্থাপন করে। তাদের সাথে বনু আসাদের মিত্ররাও ছিল। আর বনু কিনানা থেকেও কিছু লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তারা সবাই হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং দাবি জানায় যে, নামায পর্যন্ত আমরা আপনার নির্দেশ মানতে প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ, তারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং একথা বলে যে, নামায পর্যন্ত আপনার নির্দেশ মানতে সম্মত আছি, কিন্তু যাকাত প্রদান করতে আমরা সম্মত নই।কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাহাবীরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল। তারা কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং তারা মদীনার ওপর আক্রমণ করেছিল।

অর্থাৎ, মদীনার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিল যে, যদি এই দাবি না মানা হয় তবেআমরা আক্রমণ করব। মুসায়লামা তো স্বয়ং মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায়ই তাঁকে (সা.) লিখেছিল যে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আরবের অর্ধাংশ আমাদের এবং অর্ধাংশ কুরাইশদের। আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সে হাযার ও ইয়ামামা থেকে তাঁর (সা.) নিযুক্তগভর্নর সুমামা বিন উসালকে বহিস্কার করে এবং নিজে সেই অঞ্চলের গভর্নর সেজে বসে। অধিকন্তু সে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। অনুরূপভাবে মদীনার দু'জন সাহাবী হাবীব বিন যায়েদএবংআব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবকে সে বন্দি করে এবং জোরপূর্বক তাদেরকে দিয়ে নিজের নবুয়্যতের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব ভীত হয়ে তার কথা মেনে নেয়, কিন্তু হাবীব বিন যায়েদ তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানান। এতে মুসায়লামা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ কেটে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ইয়েমেনেও যারা মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত কর্ম কর্তা ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বন্দি করা হয় এবং কয়েকজনকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। একইভাবে, তাবারী লিখেছেন, আসওয়াদ আনসীও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করেছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব শাসক নিযুক্ত ছিলেন, তাদেরকে সে কষ্ট দিয়েছিল ও তাদের কাছ থেকে যাকাতের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।এরপর সে সানা'তে মহানবী (সা.)-এর নিযুক্ত শাসক শাহার বিন বাযানের ওপর আক্রমণ করে। অনেক মুসলমানকে হত্যা করে, লুটতরাজ চালায়, গভর্নরকে হত্যা করে এবং তাঁকে হত্যা করার পর তাঁর মুসলমান স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিয়ে করে। বনু নাজরানও বিদ্রোহ করে আর তারাও আসওয়াদ আনসীর সাথে যুক্ত হয় এবং তারা দু'জন সাহাবী (অর্থাৎ),আমর বিন হাযম এবং খালিদ বিন সাঈদ (রা.)-কে(তাদের) এলাকা থেকে বহিস্কার করে।

এসব ঘটনাথেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদারদের সাথে এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হয় নি যে, তারা মহানবী (সা.)-এর উম্মতী হওয়া সত্ত্বেও নবী হওয়ার দাবী করেছিল আর মহানবী (সা.)-এর ধর্ম প্রচারকের দাবীদার ছিল বরং সাহাবীরা তাদের সাথে এ কারণে যুদ্ধ করেছিলেন যে, তারা ইসলামী শরীয়তকে রহিত করে নিজেদের (মনগড়া) আইন প্রবর্তন করতো আর এবং (নিজেদেরকে) নিজ এলাকার শাসক বলে দাবি করতো আর শুধুমাত্র নিজ এলাকার শাসক হবার দাবীদারই ছিল না বরং তারা সাহাবীদেরকে হত্যা করে, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর ওপর আক্রমন হয়। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজেদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। তিনি (রা.) লিখেন, এসব ঘটনা সত্ত্বেওমওলানা মওদুদী সাহেবের এই বক্তব্য যে, মহানবী (সা.)-এর সকল সাহাবী মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদারদের সাথে যুদ্ধ করেন- এটি মিথ্যা নয় তো আর কি? যদি কেউ একথা বলে যে, সম্মানিত সাহাবীরা মানুষ হত্যা বৈধ আখ্যা দিতেন, তাহলে কি এটি কেবল এই কারণে যথার্থ হবে যে, মুসায়লামা কায্ যাবও মানুষ ছিল আর আসওয়াদ আনসীও মানুষ ছিল! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যারাবিকৃতরূপে ইসলামের ইতিহাস উপস্থাপন করে তারা ইসলামের কোন সেবা করছে না। ইসলামের সেবাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে তাদের উচিত সত্যকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া আর মিথ্যা বর্ণনা এবং বিভিন্ন ঘটনা বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

(মৌলানা মাওদুদী সাহেব কে রিসালা 'কাদিয়ানী মামলা' কা জওয়াব, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ১১-১৪)

মোটকথা, তাদের দমনের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ড থেকে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, তখন আরবের সকল বিদ্রে াহের অবসান ঘটে আর সকল মুরতাদকে দমন করা হয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) সারা দেশের এই নৈরাজ্যকে যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং দ্রুততার সাথে নির্মূল করেন তা তাঁর মহান যোগ্যতার পরিচায়ক এবং স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, কীভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট ছিলেন।

এক বছরেরও কম সময়ে ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য এবং বিদ্রোহকে নির্মূল করা আরব ভূখণ্ডে ইসলামী শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল এক বিস্ময়কর কীর্তি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের বিজয়ে সীমাহীন আনন্দিত ছিলেন কিন্তু সেই আনন্দের মাঝে কোনরূপ দম্ভ বা অহংকারের নামগন্ধও ছিল না কেননা, তিনি জানতেন; যা কিছু হয়েছে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তাঁর অনুগ্রহেই হয়েছে। স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের

মাধ্যমে সমস্ত আরবের মুরতাদদের যুদ্ধবাজ সেনাদেরমোকাবিলা করে (এবং) তাদেরকে পরাজিত করে ইসলামের পতাকা অত্যন্ত মহিমার সাথে পুনরায় সুউচ্চ করা ছিল তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সামনে তখন একটিই সমস্যা বা চিন্তা ছিল অর্থাৎ, একত্ববাদী ধর্মের শক্তি সঞ্চার এবং ইসলাম ধর্মকে সফলতার পরম শিখরে পৌঁছানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রতাপ (প্রতিষ্ঠা) আর এই আকাঙ্খাই প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনমস্তিষ্কে বিরাজ করতো।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৪৩-২৪৪)

সকল মুরতাদ বিদ্রোহীকে নির্মূল করার পরসবারই এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এখন মহানবী (সা.)-এর খলীফার সম্মুখে কোন নৈরাজ্যবাদী টিকতে পারবে না কিন্তু সাধারণ লোকদের ন্যায় হযরত আবু বকর (রা.) কোনরূপ আত্মতুষ্টির শিকার নিপতিত ছিলেন না। তিনি জানতেন, বর্হিঃশক্তি ধর্মত্যাগ এবং বিদ্রোহের নৈরাজ্যের আন্দোলনকে পুনরায় উস্কে দিয়ে (আরবে) অশান্তি ছড়ানোর কারণ হতে পারে, উক্ত নৈরাজ্য সাময়িকভাবে দমন না হয়ে থাকলে (এমনটি হতে পারে)। ইসলাম বিরোধী বর্হিঃশক্তিগুলো ছিল বড় বড় ক্ষমতাধর। তারা পুনরায় আরব-সীমান্তে অশান্তি ছড়াতে পারে তাই তিনি (রা.) কোন প্রকার বিভ্রমে নিপতিত ছিলেন না। আরব গোত্রগুলোরএই প্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলাথেকে রক্ষা লাভের জন্য যথোচিত মনে করা হয় যে, আরব গোত্রগুলোর মনোযোগ ইরান এবং সিরিয়ার প্র তিনিবদ্ধ করে দেওয়া হোক যাতেরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টির কোন সুযোগ তাদের না হয়। আর এভাবে মুসলমানরা প্রশান্তি লাভ করে আর তারা পূর্ণ মনোযোগের সাথে ধমীয় বিধান পালন করতে পারে।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা হাকীমগোলাম নবী এম.এ.পৃ: ১৭৮)

যাহোক, আরব সীমান্তের প্রতিরক্ষা এবং ইসলামী (অধ্যুষিত) রাজত্বকে নিজেদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, এসব শক্তিধর জাতিরকাছেইসলামের বাণী পৌঁছানো হয় যাতে এসব গোত্র ইসলামের এই বিশ্বজনীন বাণীকে মেনে নিয়ে অথবা অনুধাবন করে নিজেরাও শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করে এবং অন্যরাও যেন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির হাত থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে পারে। যাহোক, এর জন্য হযরত আবু বকর (রা.) কোন কোন রীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে যে, মুরতাদ বিদ্রোহীদের (বিরুদ্ধে পরিচালিত) বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান শেষ হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় মগ্ন ছিলেন অর্থাৎ, আরব এবং ইসলামের পুরোনো শত্রু; ইরান এবং রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে জন্য সুরক্ষিত থাকতে হলে কী কী কর্ম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কেননা, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবদ্দশাতেও এই দু'টি পরাশক্তি আরবকে নিজেদের অধীনস্থ রাখতে চাইতো আর মহানবী (সা.)-এরমৃত্যুর পরও যখন অনেক অঞ্চল এবং গোত্রের ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের আগুন মদীনা রাষ্ট্রকে নিজের করায়ত্বে নিয়েছিল তখন কোন কোন স্থানে এর পেছনে এসব পরাশক্তিরও একটি হাত (কার্য কর) ছিল এবং একে সুবর্ণ সুযোগমনে করে হিরাকেলের সৈন্য সিরিয়ায় এবং ইরানের সৈন্যরা ইরাকে সমবেত হতে আরম্ভ করে।হযরত আবু বকর (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে সর্বপ্র থম হযরত উসামার নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন, তিনি এসব সন্ত্রাসী এবং স্বৈরাচারী অপশক্তি সম্পর্কে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন- তা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) সবার সামনে কোন কর্মপন্থা উপস্থাপন করার পূর্বেই সংবাদ পান যে, হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা(রা.) যিনি বাহরাইনে মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নিয়ে পারস্য উপসাগরের তীর ঘেঁষে উত্তরের দিকে ইরাকের পথে অভিযান শুরু করে দিয়েছেন।

পরিশেষে তিনি সেসব আরব গোত্রগুলোর কাছে পৌঁছেন যারা দজলা এবং ফুরাতের (ডেলটাই) বদ্বীপ অঞ্চলে বা অববাহিকায় বসবাস করত। হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা (রা.) বাহরাইনের একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েলের সদস্য ছিলেন। বাহরাইনের অঞ্চলটি ইয়ামামা এবং পারস্য উপসাগরের মাঝখানে অবস্থিত ছিল আর তাতে বর্তমান কাতার এবং বাহরাইনের শাসনাধীন দ্বীপগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর রাজধানী ছিল দারীন। যাহোক, হযরত মুসান্নাহ বিন হারেসা (রা.) হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের সাথেও যুদ্ধ করেছিলেন। আর বাহরাইন ও এর পার্শ্ববর্তি এলাকায় যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আর যারা ইসলামী সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের (বিরুদ্ধে) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, হযরত মুসান্নাহ (রা.) তাদের নেতা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তখনও ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই হযরত মুসান্নাহ (রা.) স্বয়ং মদীনায় চলে আসেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইরাকের (চলমান) অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন যে, যেসব আরবগোত্র দজলা এবং ফুরাতের বদ্বীপ অঞ্চলেবা অববাহিকায় বসবাস করছে তারা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতেনির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। আরবের(অধিবাসীরা) বেশিরভাগ কৃষিকাজ করে থাকে আর যখন শষ্য পরিপক্ক হয় তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তা লুটে নেয়। তাই, হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা (রা.) নিবেদন করেন, ইসলামী সৈন্য প্রেরণ করে সেসব লোককে বিপদাপদ থেকে মুক্ত করা হোক। হযরত আবু বকর (রা.) মদীনার পরামর্শ ক সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং হযরত মুসান্নাহ্ বিন হারেসা(রা.)'র প্রস্তাব(তাদের) সম্মুখে পেশ করেন। মদীনার লোকজন যেহেতু ইরাকের পরিস্থি তি সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, তাই পরামর্শ দেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে ডেকে এনে পুরো বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করা হোক; তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হোক। হযরত খালিদবিন ওয়ালীদ (রা.) সেই দিনগুলোতে ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন, তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদীনায় ডেকে আনান। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ মদীনায় পৌঁছালে হযরত আবু বকর (রা.) যখন ইরাকে সেনা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত হযরত মুসান্নার প্রস্তাব তার সামনে উপস্থাপন করেন, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদেরও এই ধারণা ছিল যে, হযরত মুসান্না ইরাক-সীমান্তে ইরানীদের বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম আরম্ভ করেছেন, আল্লাহ্ না করুন- তা যদি ব্যর্থ হয় এবং হযরত মুসান্নার বাহিনীকে আরবের দিকে পিছু হটতে হয়- তাহলে ইরানী শাসকবর্গ আরও ধৃষ্ট হয়ে উঠবে।

তারা কেবল হযরত মুসান্নার বাহিনীকে ইরাকের সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং বাহরাইন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পুনরায় তাদের প্রভাব-প্র তিপত্তি বিস্তার এবং একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করবে। আর এমন পরিস্থিতিতে ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য শঙ্কা দেখা দিবে। তাই তিনিও বলেন, সেই শঙ্কা থেকে বাঁচার জন্য সকল প্রকার সাহায্য পাঠানো হোক; হযরত মুসান্নার কাছে সেখানে সেনাদল পাঠানো হোক এবং ইরানীদেরকে আরব সীমান্তেআগ্রাসন/প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার (সুযোগ দেয়ার) পরিবর্তে আরও পিছু হটতে বাধ্য করা হোক যাতে তাদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে কখনও আরবের জন্য কোন শঙ্কা বাকি না থাকে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার এই মতামত উপস্থাপন করেন। তার এই মতামত শুনে অন্যান্য সাহাবীরাও হযরত মুসান্নার প্রস্তাবগুলো মেনে নেন আর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুসান্নাকে সেসব লোকের নেতা মনোনীত করেন যাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ইরাক সীমান্তে অগ্রাভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং নির্দেশ দেন, আপাততঃ সেখানকার আরবের বিভিন্ন গোত্রকে সাথে যুক্ত করার এবং ইসলামগ্র হণে সম্মত করার চেষ্টা করুন। একইসাথে একথাও বলেন, শীঘ্র ই মদীনা থেকেও একটি সেনাদল তাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হবে যাদের সাহায্যে তিনি আরও অধিক সেনাভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে পারবেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মত হলো, হযরত মুসান্না সাহায্যের আবেদন জানাতে আদৌ মদীনায় যান নি, কিংবা হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তার সাক্ষাতও হয় নি, বরং তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বদ্বীপ অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে (সেনাভিযান পরিচালনা) করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যান এবং সামনে গিয়ে(তাকে) ইরানী সেনাপতি হুরমুযের সেনাদলের মুখোমুখি হতে হয়। হুরমুযতখন সীমান্ত বাহিনীর প্রধান ছিল এবং কিসরার দরবারে কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ যে পদমর্যাদা লাভ করতে পারতো- হুরমুয তাদেরই একজন ছিল। হুরমুয ও মুসান্নার মাঝে তখনও যুদ্ধ চলমান ছিল- এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) এসব ঘটনার সংবাদ জানতে পারেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসান্নার নাম সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিলেন। এসব সংবাদ পৌঁছার পরে যখন তিনি সত্যাসত্য যাচাই করেন তখন জানতে পারেন, মুসান্না ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ দমনের যুদ্ধকালে বাহরাইনের ভেতর অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন হযরত মুসান্নার সাহায্যার্থে একটি বাহিনী নিয়ে ইরাক গমন করেন এবং হুরমুযকে পরাজিত করে হীরাঅভিমুখে যাত্রা করেন।

হীরাও কূফা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। যাহোক, একইসাথে তিনি (রা.) হযরত আইয়ায বিন গানামকে নির্দেশ

দেন, তিনি যেন দুমাতুল জন্দলেযান; [দুমাতুল জন্দল সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি দুর্গ ও বসতির (নাম), যা মদীনা থেকে তৎকালীন ভ্রমণের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পনের-ষোল দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল।] আর (সেখানে গিয়ে) সেখানকার বিদ্রোহী ও মুরতাদ বাসিন্দাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে হীরা চলে যান। হযরত আইয়ায বিন গানাম (রা.)মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে অংশগ্র হণও করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা নিজের মৃত্যুর সময় তাকে সিরিয়ায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে সেই পদে বহাল রাখেন এবং বলেন, আমি সেই আমীরকে পরিবর্তন করব না যাকে হযরত আবু উবায়দা আমীর নিযুক্ত করেছেন।

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ও হযরত আইয়ায বিন গানামের মধ্যে যিনি প্রথমে হীরা পৌঁছবেন, তিনি-ই উক্ত অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনাকারী সৈন্যদলের নেতৃত্ব লাভ করবেন।

(হযরত আবু বাকার, সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৬১-২৬৬) (এটলাস সীরাতুনবী, পৃ: ৬৮) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৭৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১২৩) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৫)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন ইয়ামামায় দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)তাকে লিখেন, ফাজ্জুল হিন্দ তথা আবুল্লাহ্ থেকে শুরু করুন এবং ইরাকের উপরাঞ্চল বা পর্বতাঞ্চল দিয়ে ইরাকে যান আর লোকদেরকে নিজের সাথে যুক্ত করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে (তথা ইসলামের) আহ্বান জানান। তারা গ্রহণ করলে ভালো অন্যথায় তাদের কাছ থেকে জিযিয়া বা কর গ্রহণ করুন, কিন্তু তারা যদি কর দিতেও অস্বীকার করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আরও নির্দেশ দেন, কাউকে নিজের সাথে যুদ্ধের জন্য যেতে বাধ্য করবেন না আর ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করবেন না এমনকি সে যদি পরবর্তীতে ইসলামে ফিরে আসে তবুও আর যে মুসলমানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন, তাকে নিজের সাথে যুক্ত করে নিন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদের সাহায্যার্থে সেনাদল প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

(আল বাদাইয়া ওয়াননাহাইয়াহ লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ ষ্ঠ ভাগ, পৃ:৩৩৮)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ইয়ামামা থেকে ইরাক অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে নিজের সেনাদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন এবং সবাইকে একই পথ দিয়ে প্রেরণ করেন নি বরং হযরত মুসান্না (রা.)-কে স্বীয় যাত্রার দু'দিন পূর্বে প্রে রণ করেন। এরপর আদী বিন হাতেম এবং আসেম বিন আমরকে একদিন বিরতি দিয়ে প্রেরণ করেন, সবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বয়ং যাত্রা করেন। তাদের সবার সাথে হাফীরে সমবেত হওয়ার অঙ্গীকার করেন যেন সেখান থেকে সম্মিলিতভাবে শত্রুর ওপর আক্রমণ করতে পারেন। হাফীর বসরা থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রাপথে প্রথম বিরতির স্থান। আর এটি লেখা আছে যে, এইসীমান্তটি পারস্যের সকল সীমান্তের মধ্যে জাঁক-জমক ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সবচেয়ে বৃহৎ এবং সুদৃঢ় সীমান্ত ছিল আর এর শাসক ছিল হুরমুয। এখানকার সেনাপতি এক দিকে স্থলভাগে আরবদের সাথে যুদ্ধ করতো আর (অপরদিকে) সমুদ্রপথে দিয়ে হিন্দের অধিবাসীদের সাথে।

(তারিখু তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৯) (আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৯)

যাহোক, হযরত খালিদ (রা.)'র সৈন্যসংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল কেননা, প্রথমতঃ তাদের বৃহদাংশ ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ ইরাক যেতে না চায় তাহলে তার ওপর বলপ্র য়োগ করবে না এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এটিও দিয়েছিলেন যে, এ ছাড়া কোনো প্রাক্তন মুরতাদকে, যদিও সে পরবর্তীতে ইসলামকবুল করুক না কেন, খলীফার কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইসলামী সৈন্যদলে (তাদের) যুক্ত করবে না। হযরত খালিদ হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আরও সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রেরণের জন্য (পত্র) লিখলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য কেবল একজনকে অর্থাৎ, কা'কা বিন আমরকে প্রেরণ করেন। লোকেরা (এতে) খুবই অবাক হয় এবং তারা নিবেদন করেন, আপনি খালিদের সাহায্যার্থে কেবল একজনকে পাঠাচ্ছেন অথচ বাহিনীর বৃহদাংশ এখন তার থেকে পৃথক হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, যে সেনাদলে কা'কার মতো ব্যক্তি যুক্ত হয়তারা কখনো পরাজিত হতে পারে না। তদুপরি কা'কার হাতে তিনি হযরত খালিদকে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যাতে লিখেন; তিনি যেন ঐসব লোককে নিজ সেনাদলে যোগদানেঅনুপ্রাণিত করেন যারা মহানবী (সা.)-এর (মৃত্যুর) পরেও যথারীতি ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এই পত্র পাওয়ার পর হযরত খালিদ নিজ সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করতে আরম্ভ করেন।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৬৮)

ইরাকের কৃষকদের বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং যে কর্ম পন্থা ছিল, এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, আরবরা ইরাকের ভূখণ্ডে কৃষিকাজ করতো। ফসল কাটা হলে তারা এর খুব সামান্য অংশ ভাগে পেত। অধিকাংশ (শস্য) ঐসব ইরানী গৃহস্তের কাছে চলে যেত যারা ঐসব জমির মালিক ছিল। এই জমির মালিকরা দরিদ্র আরবদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো এবং তাদের সাথে ক্রীতদাসের চেয়ে জঘন্য দুর্ব্যবহার করত। হযরত আবু বকর (রা.) ইরাকে নিজ সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দেন যে, যুদ্ধের সময় ঐসব কৃষকদের যেন কোনরূপ কষ্ট দেওয়া না হয় আর তাদেরকে (যেন) হত্যা করাও না হয় এমনকি বন্দি বানানোও না হয়। মোটকথা, তাদের সাথে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার যেন না করা হয় কেননা, তারাও তাদের মতোই আরব আর ইরানীদের অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। তাদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত করা উচিত যে,এখানে আরবদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের নির্যাতিত জীবনের অবসান ঘটবে। আর তখন তারা তাদের স্বজাতির লোকদের কল্যাণে সত্যিকার ন্যায়বিচার, প্রাপ্য স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাগিদার হতে পারবে। হযরত আবু বকর (রা.)'র এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণে ধন্য করে। তাদের বিজয়ের পথে সুগম হয় আর তাদের এই আশংকা থাকে না যে, অগ্রাভিযান পরিচালনার সময় পাছে কোথাও পেছন থেকে আক্রমণের শিকার হয়ে তাদের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৬৭-২৬৮)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন নিবাজ-এ শিবির স্থাপন করেন তখন হযরত মুসান্না তার সেনাদলের সাথে খাফ্ফান-এ অবস্থান করছিলেন।

নিবাজ হচ্ছে, বসরা ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী একটি স্থান। আর খাফ্ফান হচ্ছে, কূফার নিকটবর্তী একটি জায়গা। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত মুসান্নাকে একটি পত্র লিখেন যেন তিনি তার কাছে আসেন। আর এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র সেই পত্রও প্রেরণ করেন, যাতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুসান্না বিন হারেসাকে হযরত খালিদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(তারিখুত তাবারী,২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৮) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৯৬) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৪)

এগুলো সবইতারীখে তাবরীর রেওয়ায়েত। পূর্বে তিনি ছিলেন, এরপর হযরত খালিদকে স্বয়ং হযরত আবু বকর (রা.) প্রেরণ করেন। যাহোক, এরপর বিভিন্ন যুদ্ধ হয়। কোন কোন যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোর নাম কি ছিল? ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে এগুলো বিজয়ের উল্লেখকরা হবে। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমানেরা ইরানীদের বিরুদ্ধে ইরাকের অঞ্চলে এসব যুদ্ধ করেছে আর তাতে যেসব বিজয় আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন তা (আগামীতে) উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

****

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, Murshidabad.

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত

গত ৯ জানুয়ারি ২০২২ আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন নাইজেরিয়ার সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে MTA ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন নাইজেরিয়ার ৩০ এর অধিক সদস্য নাইজেরিয়ার লাগোসের ওজোকোরোতে অবস্থিত লাজনা হল থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের পর উপস্থিত শিক্ষার্থীগণ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন খাদেম হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সচরাচর দেখা দেওয়া কদর্যতা ও অনৈতিকতাসমূহ হতে অন্যান্য খোদ্দামদের দূরে রাখতে পারেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একজন আহমদী মুসলমানের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন হওয়া উচিত আমাদের সদস্যদের 'বয়আতের শর্তসমূহ' নামক বইটি প্রদান করে ইসলাম-আহমদীয়াতের সঙ্গে তাদের বন্ধনকে স্মরণ করাতে থাকো। তাদেরকে বলো, এ সকল শর্তাবলী মেনেই তুমি ইসলাম-আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছো এবং তুমি অঙ্গীকারবদ্ধ যে, তুমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। বর্তমান যুগে এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূল নয়, তবুও আহমদী মুসলমান শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"সুতরাং, আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি এ বিষয়গুলো বুঝতে পারে তাহলে তারা নিজেদের পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে।

দেখো! আমরা পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে এসেছি, আমরা দাবি করি আমরা পৃথিবীর সংস্কার করবো। যদি আমরা নিজেরাই এসব খারাপ কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি তাহলে কীভাবে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো? খোদ্দামুল আহমদীয়ার অঙ্গীকারে তোমরা বলে থাকো 'আমি সব কিছু ত্যাগ করবো'। তুমি যদি তোমার আবেগকে ত্যাগ করতে না পারো, ইসলামের শিক্ষার চর্চা না করো, তাহলে কীভাবে তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে?

সুতরাং প্রত্যেক খাদেমকে উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করো- এটি তোমার অঙ্গীকার, এটি আমাদের সীমা। এগুলো হচ্ছে আনুগত্যের অঙ্গীকারের শর্তাবলী এবং আমাদেরকে এগুলো পূর্ণ করতে হবে যেন আমরা নিজেদের সংশোধন করতে পারি এবং জাতির সংশোধন করতে পারি। তখন দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। অন্যথায়, আমরা যদি এমন আচরণ করি তখন মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, পরিশেষে আমাদের এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং পরকালে এর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তাদেরকে তোমার এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করাতে হবে। তারা যদি এটি বুঝে নেয় তাহলে তো খুবই ভাল, অন্যথায় তোমার দায়িত্ব কেবল উপদেশ দেওয়া। তাদেরকে উপদেশ প্রদান করতে থাকো।"

অপর একটি প্রশ্ন ছিল যারা শুনতে আগ্রহী নয় তাদের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্পর্কিত।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেছেন যে, তুমি বলপ্রয়োগ করে তোমার বার্তা পৌঁছাতে পারবে না। যারা তোমার কথা শুনছে না তাদেরকে ছেড়ে দাও। যারা নৈতিক দিক থেকে ভাল এবং পবিত্র প্রকৃতির তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলো। যখন তারা তোমার বন্ধু হয়ে উঠবে তখন তাদেরকে বলো তুমি কে, আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত কী এবং কেন আমরা ইসলাম-আহমদীয়াতে বিশ্বাস করি। সুতরাং এটি হল তাদের কাছে প্রচারের উপায়। অন্যথায় তুমি কাউকে তোমার কথা শুনানোর জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারো না।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাস (আই.)-কে প্রশ্ন করেন কীভাবে তারা ধর্মীয় কার্যাবলী ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার সর্বপ্রথম ধর্মীয় কাজ হল প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত হও এবং তোমার ফজরের নামায আদায় করো। এরপর কুরআন তেলাওয়াত করো এবং তোমার স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি নাও। তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ বা ৭ ঘণ্টা কাটানোর পর, যখন তুমি ফিরে আসবে, তোমার শিক্ষকবৃন্দ যদি কোনো পড়া বা বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন তাহলে সেটি সম্পন্ন করবে এবং এরপর যদি সময় থাকে তাহলে ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি এগুলো তোমার চিন্তা-ভাবনাকে পরিবর্তন করবে। তুমি নিজেকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে ভাল হতে চেষ্টা করবে। স্বেচ্ছাশ্রমের ক্ষেত্রে, তুমি যদি প্রতিদিন খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারো তাহলে অন্তত তোমার ছুটির দিনগুলোতে আহমদীয়া মুসলিম জা'মাতের কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, তোমার প্রথম দায়িত্ব পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা। পাশাপাশি, কখনও প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামায ও কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করবে না"।

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস) হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন আর আমেলা সদস্যগণ নরওয়ের অসলোতে অবস্থিত বায়তুন নাস্‌র মসজিদ থেকে ভার্চুয়ালি এই সভায় যোগদান করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সাথে কথোপকথনের এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি তরবিয়ত-এর সঙ্গে কথা বলার সময় হুযূর আকদাস নিয়মিত নামায আদায় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন: "আপনার কাজ মানুষকে বোঝানো। যদি তারা আহমদী মুসলমান হন, তবে তাদেরকেও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেবল বয়আত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়ার কোনো মূল্য নেই। বরং আপনাকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল স্তম্ভের ওপর অবশ্যই আমল করতে হবে।"

অডিও ও ভিডিও বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি সামী বাসরী-এর সঙ্গে কথা বলার সময়, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"আপনার কিছু অনুষ্ঠান তৈরি করে এমটিএ-তে সম্প্রচারের জন্য প্রেরণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, নরওয়ে খুব সুন্দর একটি দেশ। অতএব আপনার উচিত এ দেশটি সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিতও কিছু তথ্যচিত্র নির্মাণ করা।"

হুযূর আকদাস উমূর-এ-আমা বিভাগের কাজের রূপরেখাও প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"বিরোধ নিষ্পত্তি একটি সম্পূরক কাজ, অন্যথায় [উমর-এ-আমা বিভাগের] প্রধান কাজ হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের দেখাশোনা করা। তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং যেকোনো সমস্যায় সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা কর্মসংস্থান নিয়ে সমস্যায় থাকেন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে এ বিভাগের উচিত তাদের ও তাদের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং যদি তারা কষ্টে জর্জরিত থাকেন, তাহলে, তাদের অবস্থার উপশম ও উন্নতির জন্য সমাধান খোঁজা।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআন পাঠে কীভাবে সদস্যদের আরও উত্তমভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে? (এরপর শেষের পাতায়...)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

২০২২ সালের মে মাসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:যেমনটি আপনারা অবগত আছেন, বিগত দুই বছর কোভিড-১৯ মহামারি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন কাটছাঁট ও সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য করেছে আর আমাদের জামা'তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানও এর কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

বিগত দুই বছর যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য জামা'ত নিজেদের জাতীয় মজলিসে শূরা ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) পরিচালনা করেছে এবং তাতে আলোচনার বিষয়ও স্বাভাবিকের তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল।

অতএব আজ এটি একটি আনন্দের বিষয় যে, প্রায় তিন বছর পর আল্লাহ্ তা'লা যুক্তরাজ্য জামা'তের মজলিসে শূরা সশরীরে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের এবং পূর্ণরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার ধারণা কানাডা, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কিছু দেশের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আলহামদুলিল্লাহ্, এ বছরটি শূরার ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী আর তাই আমি আশা করি সকল সদস্য এই মাইলফলক নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই ক্রমাগতভাবে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে এবং এর পরিধি (এখন) বহুগুণে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমাদের জামা'তের ইতিহাসের প্রতি অগভীর দৃষ্টিপাতও একথার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সর্বদা আমাদের সাথে ছিল। তিনি আমাদের জামা'তকে সব দিক থেকে সমৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের সক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং একথাটি মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নিশ্চিতভাবে প্রযোজ্য। সেই কল্যাণমণ্ডিত বীজ যা আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে বপিত হয়েছিল তার শেকড় কেবলমাত্র দৃঢ়তাই লাভ করে নি, বরং তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে এখন এর ফলসমূহ পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক এমন দেশ যেখানে জামা'ত নিজেদের পূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর তা ক্রমাগতভাবে উন্নতি করে চলেছে। যদিও যুক্তরাজ্য জামা'ত এক শতাব্দীকালেরও বেশি সময় পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এখানে নিয়মিত মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা আরম্ভ হয় জামা'ত প্রতিষ্ঠার কয়েক দশক পরে। প্রকৃতপক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের পরই এই ব্যবস্থাপনা আরও সুচারুরূপে ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে শুরু করে।

বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ও কার্যপ্রণালীগত দিক থেকে বিবেচনা করলেও আমার মতে, যুক্তরাজ্য জামা'তের মজলিসে শূরা যথেষ্ট পরিণত। আমার আশা, ইউরোপীয় জামা'তসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং আফ্রিকার বড় বড় জামা'তসহ অন্য যেসকল দেশে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন তাদের অবস্থাও একই হয়ে থাকবে।

মজলিসে শূরার নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং যেসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয় সেগুলো শূরার প্রতিনিধিদের মাঝে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাব-কমিটি গঠন করে প্রস্তাবগুলোর ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণের পর পুরো শূরার সামনে তা পুনরায় উপস্থাপন করা হয়, যেখানে শূরার সদস্যরা পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করেন যতক্ষণ না মতৈক্যে পৌঁছা সম্ভব হয়। পদ্ধতিগত বিষয়গুলো বর্তমানে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু পদাধিকারী ও (শূরার) প্রতিনিধির মাঝে তাদের ওপর যে আমানত ও গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে উপলব্ধির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, মজলিসে শূরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জাগতিক কোন সংসদ বা পরিষদের মতো নয়। যদি আমরা জাগতিক সংসদের কার্যধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই, সেখানে অনেক সময় এমন বৃথা তর্কবিতর্ক চলতে থাকে যা সংসদ সদস্যদের মাঝে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণ্য সংঘাত ছাড়া আর কোন ফলাফল বয়ে আনে না। পরিণামে তাদের কার্যক্রম তাদের লোকদের মাঝে বিভেদের বীজ বপন করে আর প্রায়শই জাতিসমূহের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে, যেমনটি আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। এমন রাজনীতির জগতে সাধারণত দুটি পক্ষ থেকে থাকে যাদের পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা থাকে। তাদের সদস্যরা পূর্বলালিত ধ্যানধারণা বা নীতির ভিত্তিতে কাজ করে যা তারা বিরোধী পক্ষের দোষগুণ বিচার না করেই পাশ করাতে চায়। তারা চায় তাদের দলের নীতিই গৃহীত হোক আর তারা অন্য পক্ষের ওপর নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও অভিলাষ চাপিয়ে দিতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতালোভী হয়ে থাকে এবং জনগণের সমর্থন আদায় আর নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা অবস্থানকে দৃঢ় করতে লালায়িত থাকে। নিশ্চিতভাবে জাগতিক সংসদ ও পরিষদের একটি বৈশিষ্ট্য হল তাদের সদস্যরা প্রায়শই নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সত্য ও ন্যায়ের বিপরীতে ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজ দলের প্রতি বিশ্বস্ততাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ্, যেমনটি আমি বলেছি, মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা কোন রাজনৈতিক বা জাগতিক সংসদ-সমাবেশের মতো নয়, বরং এটি একটি পরামর্শ-সভা যা যেকোন সংসদ বা কংগ্রেস থেকে অধিক মর্যাদা ও উচ্চতা রাখে। তবে এই মর্যাদা ও মূল্য ততদিন পর্যন্তই বিদ্যমান থাকবে যতদিন মজলিসে শূরার সদস্যরা সততার মূর্ত প্রতীক হবেন এবং উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করবেন আর সকল প্রকার কূটচাল ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, মজলিসে শূরার মূল উদ্দেশ্যই হল এমন সব প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা যেগুলো যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণতা দানে সহায়ক হবে, যাঁকে মহানবী (সা.)-এর মহামহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব আপনাদের দায়িত্ব যুগ-খলীফার নিকট আপনাদের নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ উপস্থাপন করা যিনি সমগ্র জামা'তের আধ্যাত্মিক পিতাতুল্য। তিনি কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপনাদের পরামর্শসমূহ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন আর তা হল, যে পরিকল্পনা বা নীতি-ই প্রণীত হোক না কেন, তা যেন ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হয় এবং মানবজাতিকে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আকর্ষণ এবং একে অন্যের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে।

অতএব আমার আশা ও প্রত্যাশা হল আপনারা পুরোটা সময় পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে ও যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে থাকবেন। এক্ষেত্রে কোন অজুহাত দেখানোর সুযোগ নেই, কেননা যুগ-খলীফা মজলিসে শূরার প্রতিনিধিবর্গ ও জামা'তের পদাধিকারীদের অগণিতবার তাদের দায়িত্বাবলী স্মরণ করিয়েছেন। আপনাদের প্রত্যেকের এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আপনারা কোন জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হন নি। শূরায় আপনাদের যোগদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আপনাদের ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার।

আপনাদের অনুধাবন করতে হবে যে, মজলিসে শূরা হল ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অতএব আপনাদের নিজ দায়িত্ব পরম নিষ্ঠা ও পূর্ণ সততার সাথে পালন করা উচিত। যদি আপনারা এমন মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করেন, তবে আপনি কখনও ভাববেন না যে, কেবল আপনিই সঠিক বা আপনার মতামতই অন্যদের মতের চাইতে বেশি গুরুত্ব বহন করে। জাগতিক কোন রাজনৈতিক দলের মতো আপনি কোন দলাদলি করবেন না; বরং জামা'ত ও মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে আপনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, আমরা কেবলমাত্র একটি দলেরই কাজ করতে চাই এবং সেই দলেরই অংশ হতে চাই আর সেই দলটি হল আল্লাহ্ তা'লার দল।

আমি পূর্বেও বলেছি, প্রত্যেক দেশ যেখানে জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মজলিসে শূরার কাঠামোও গড়ে উঠেছে। তবে এটি বললে ভুল হবে যে, সমস্ত কার্যক্রম নিখুঁতভাবে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

সম্পন্ন হয় বা তা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শূরার কতক প্রতিনিধি কেবলমাত্র তর্কের খাতিরে তর্ক করেন, অথবা এমন তুচ্ছ বিষয় উত্থাপন করেন যা আলোচ্য বিষয়ের সমাধান বা অগ্রগতিতে কোন ভূমিকাই রাখে না। একইভাবে কোন কোন সময় দেখা যায় কতক প্রতিনিধি মনে করেন তাদের মতের বিরোধিতাকারী ব্যক্তিবর্গ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে না। আমি এইমাত্র যা বললাম সে অনুসারে আমি আশা করব, আপনাদের কেউ কেবলমাত্র অন্যের ওপর নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অথবা অহংবোধের কারণে অহেতুক তর্কে লিপ্ত হন নি। বরং আমার আশা প্রত্যাশা হল, যে মতামত ও পরামর্শই প্রদান করেছেন, তা খোদাভীতিকে সামনে রেখে আন্তরিকতার সাথে মজলিসে শূরার মূল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিগোচর রেখে দিয়ে থাকবেন যা হল পৃথিবীর সকল জাতি ও মানুষের নিকট সফলভাবে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া।

আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছিল, এই বছরটি আমাদের জামা'তে মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী আর এমন যুগসন্ধিক্ষণে অতীতের দিকে ফিরে দেখা প্রয়োজন যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর যে কল্যাণরাজি বর্ষণ করেছেন তা আরো ভালভাবে মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা যদি ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম শূরার দিকে ফিরে তাকাই, তবে দেখতে পাই তখন সমগ্র জামা'তের জন্য যে বাজেট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) উপস্থাপন করেছিলেন তা সর্বসাকুল্যে ৫৫,০০০ রুপি ছিল। মুদ্রাস্ফীতির কথা বিবেচনা করলেও বর্তমান বাজারে তা ১৫০,০০০-২০০,০০০ (দেড়-দুই লক্ষ) পাউন্ডের বেশি হবে না, অথচ বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য জামা'তের বাৎসরিক বাজেটই কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছে গেছে। একই কথা জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য জামা'তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্নাতীতভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জামা'তের প্রতি অনুগ্রহের যে বারিধারা বর্ষণ করেছেন তা অপরিমেয়। একটি সময় ছিল যখন ওয়াকেফে যিন্দেগীদের (জীবন উৎসর্গকারীদের) ন্যূনতম ভাতাটুকু প্রদান করার সক্ষমতাও জামা'তের ছিল না। এরূপ কষ্টের সময় ওয়াকেফীনরা ধৈর্য ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ভাতা না পেলেও তারা কখনও অভিযোগ করেন নি, বরং গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে জামা'তের সেবা করার পাশাপাশি তারা এবং তাদের পরিবার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন এবং পরম কৃচ্ছতা সাধন করে দিনাতিপাত করেছেন। তাদের এই ত্যাগের কথা আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই। নিশ্চিতভাবে তারা বর্তমানে কর্মরত ওয়াকেফীন, জামা'তের সকল পদাধিকারী ও শূরার প্রতিনিধিদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক আহমদীর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা জামা'তের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় এখন অনেক উন্নত, যদিও জামা'তের সকল সদস্যের চাঁদায় অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়।

এখন আর সেদিন নেই যখন মসজিদ নির্মাণের জন্য আমাদের তহবিল থাকবে না বা আমাদের বইপত্র ছাপানোর জন্য হাতে অর্থ থাকবে না। এখন এমনটিও হয় না যে, তবলীগি কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে মজলিসে শূরার সদস্যদের বেগ পেতে হয় অথবা আমাদের জামা'তের সার্বক্ষণিক কর্মীদের ভাতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ আমাদের থাকবে না। এসব বিষয়ে এখন আর চিন্তা করতে হয় না। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, অর্থাৎ জামা'তের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কাঠামোর ব্যয়ভার বহন করাও কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যেখানে, ইসলামের সেবায় কোন কোন দেশের একেকটি বিভাগকে তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে।

অতএব, এখন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, আমাদের মাঝে কি এখনও সেই উচ্চমার্গের আত্মত্যাগ, সহ্যক্ষমতা এবং ধৈর্যের স্পৃহা বিদ্যমান রয়েছে যা আমাদের পূর্বসূরীগণ প্রদর্শন করেছিলেন? আমরা কি সেই একইরকম আবেগ ও আত্মনিবেদনের প্রেরণা নিয়ে ইসলামের সেবা করতে প্রস্তুত আছি? আমরা কি ইসলামের জন্য সকল প্রকার আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত? আমরা বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি, যে ওয়াদা করেছি সেগুলো কি কেবলই বুলিসর্বস্ব এবং অর্থহীন দাবি? জামা'তের সকল কর্মকর্তা এবং শূরার সদস্যকে গভীরভাবে এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

যেমনটি আমি বলেছি, আমরা সবাই এ বিষয়ের সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ জামা'তের ওপর প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্, এখন আমরা একযোগে বিশ্বজুড়ে বহুমুখী তবলীগি কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছি আর মসজিদ এবং কেন্দ্র নির্মাণ করছি, যার সবগুলো অন্যদের কাছে ইসলামের বাণী প্রচার এবং আমাদের সদস্যদের নৈতিক এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত। জামা'তের অনেক সদস্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে আর্থিক কুরবানীতে বেশ অগ্রসর হচ্ছেন। চাঁদা আম এবং জামা'তের অন্যান্য নিয়মিত আর্থিক খাতসমূহের মাধ্যমে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের বাইরেও কিছু আহমদী বিভিন্ন গরীব দেশে ব্যক্তিগতভাবে মসজিদ নির্মাণের পুরো ব্যয়ভার বহন করছেন। যুক্তরাজ্যে কয়েক বছর পূর্বে মসজিদে আগুন লাগার পর যুক্তরাজ্য জামা'ত বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছে। এটি ছিল বিশাল একটি প্রকল্প এবং আর্থিকভাবে যুক্তরাজ্য জামা'তের জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। যদিও অন্যান্য দেশের আহমদীগণও এ উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ প্রদান করেছেন, কিন্তু এই প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থ যুক্তরাজ্য জামা'তের সদস্যগণের অনুদান হতে সংগৃহীত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ কল্যাণরাজি এবং জামা'তের সদস্যদের আত্মত্যাগের স্পৃহা প্রত্যক্ষ করার পর আপনাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য হল, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সিজদাবনত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আরও অগ্রগামী হওয়া। এটিকে সেক্রেটারি মাল, সেক্রেটারি ওয়াকফে জাদীদ, সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ এবং জামা'তের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের উত্তম কাজের ফল হিসেবে বিবেচনা না করে, আপনাদেরকে অনুধাবন করতে হবে, এসব প্রকল্প কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার খাতিরে জামা'তের সদস্যদের হৃদয়ে প্রোথিত আত্মত্যাগের প্রবল স্পৃহার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

এর পাশাপাশি, প্রত্যেক পদাধিকারী এবং প্রত্যেক আহমদীকে মনে রাখতে হবে, কেবল আর্থিক কুরবানী করেই আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নতি করার মৌলিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই না আর মজলিসে শূরার সদস্যদের মনেও এমন ভ্রান্তি থাকা উচিত নয় যে, আজ এই হলঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। এ কথা মনে করবেন না, কেবল বাজেট নিয়ে বিতর্ক করে এবং তবলীগ, তরবীয়ত ও অন্যান্য দপ্তরে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে বা শূরার বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। বরং এখন থেকে নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক চরিত্র ক্রমাগত উন্নত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করুন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার কাছে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করুন, যেন তিনি আপনার দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটিকে ঢেকে দেন। আর এই দোয়াও করুন, শূরায় যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন এবং যুগ খলীফা যে পরিকল্পনাকেই অনুমোদন দান করুন না কেন, সেগুলো যেন সর্বোত্তম উপায়ে বাস্তবায়িত হয়।

উপরন্তু প্রত্যেক পদাধিকারী এবং শূরার সদস্যের দায়িত্ব হল, জামা'তের অপরাপর সদস্যদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যে, কেবল আর্থিক কুরবানী করলেই তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ হবে না বরং তাদের এই আর্থিক কুরবানী কখনওই গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার মান উন্নত করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কেবল তখনই জামা'তের সদস্যরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ঐশী কল্যাণরাজিতে ধন্য হয়।

সকল আহমদী মুসলমানই যদি এই প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে এটি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে। আমরা যদি ইবাদতের মানকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন কল্যাণ ও পুরস্কারকে আকর্ষণ করে থাকেন। অতএব, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা শূরায় গৃহীত সকল পরিকল্পনা ও সুপারিশকে কল্যাণমণ্ডিত করেন। আপনারা কেবল প্রশাসনিক দায়িত্বই সঠিকভাবে সম্পন্ন করবেন এমন যেন না হয়। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনাদের এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া করা যারা ইবাদতের মান ক্রমাগতভাবে

৮ পাতার পর.....

উন্নত করতে থাকে এবং যারা তাদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মান এতটাই উন্নত করেন যে, তারা অন্য সবার জন্য প্রকৃত অর্থেই অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে যান। আপনারা যদি এভাবে আপনাদের জীবন যাপন করতে পারেন তবে আপনারা দেখবেন, অন্যের কাছে ইসলাম প্রচার এবং জামা'তের সদস্যদের তরবীয়ত– এ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ স্বভাবত আপনাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। জামা'তের সদস্যগণ নিজেদের সংশোধন করে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে পারলে এটি সুনিশ্চিত যে, তবলীগের দ্বারসমূহ পুরোপুরি খুলে যাবে এবং ইসলাম প্রচারের নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হবে।

তবলীগ এবং তরবীয়ত প্রসঙ্গে এ সুযোগে আমি মজলিসে শূরার সকল সদস্যকে পবিত্র কুরআন এবং জামা'তের বইপত্র প্রকাশনা ও বিতরণের গুরুত্ব স্মরণ করাতে চাই। অতীতে এমনও সময় ছিল যখন পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বইপুস্তক বহু সংখ্যায় মুদ্রণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় প্রতি বছর জামা'ত হাজার হাজার বইপুস্তক, সাময়িকী এবং লিফলেট প্রকাশ করছে। উদাহরণস্বরূপ, এ বছর পবিত্র কুরআনের মূল আরবী সুন্দর একটি ফরমেটে মুদ্রিত হয়েছে, অনুরূপভাবে মৌলবী শের আলী সাহেব (রা.)'র ইংরেজি অনুবাদটিও প্রকাশিত হয়েছে।

একই সাথে মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের 'স্প্লিট ওয়ার্ড' বা শাব্দিক উর্দু অনুবাদও বহুল সংখ্যায় ছাপানো হচ্ছে। এছাড়া হাদীস, মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও খলীফাদের বইপুস্তক এবং অন্যান্য বইও ছাপানো হচ্ছে।

যেখানে একটি সময় এমন ছিল, যখন আমাদের বইপত্র প্রকাশের অর্থায়ন করতে হিমসিম খেতে হয়েছে, সেখানে আজ যখন কিনা আমাদের পুস্তকপুস্তিকার সরবরাহ পর্যাপ্ত, এখন ওকালতে ইশায়া'ত (বা প্রকাশনা) দপ্তরের রিপোর্ট বলছে যে, ন্যাশনাল জামা'তসমূহ এবং জামা'তের সদস্যগণ জামা'তের বইপুস্তক কিনছে না এবং বিতরণও করছে না। এর ফলে জামা'তের এই সম্পদ থেকে যে হারে লাভবান হওয়া উচিত ছিল তা ব্যাহত হচ্ছে। বস্তুত জামা'তের কেন্দ্রীয় স্টোরের শেলফে বিশাল সংখ্যায় বইপুস্তক দীর্ঘ সময় ধরে মজুদ পড়ে আছে।

অনুরূপভাবে, ন্যাশনাল জামা'তগুলোকে যেসব বইপুস্তক প্রেরণ করা হয়, সেগুলোরও সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না আর প্রায়শ সেগুলো দেশীয় স্টোরে পড়ে থেকে তাতে ধুলো জমতে থাকে বলে আমার ধারণা। অথচ বিষয়টা এমন হওয়া উচিত ছিল যে, ন্যাশনাল জামা'ত ঘন ঘন, এত বেশি পরিমাণে বইয়ের নতুন চাহিদা প্রদান করবে যে, ওকালতে ইশায়া'ত বইয়ের যোগান দিতে হিমসিম খেয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় এবং দেশীয় পর্যায়ের সকল স্টোর থেকেই বইয়ের মজুদ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া এবং আহমদীদের বাড়িঘরে এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের যেরে তবলীগ বন্ধুদের হাতে এসব বই পৌঁছে যাওয়াই হবে ইশায়া'তের প্রতি সুবিচার করা।

অতএব, যুক্তরাজ্য জামা'ত এবং অন্যান্য জামা'ত যারা আমার বক্তব্য শুনছেন তাদের জোর প্রয়াস চালানো উচিত যেন আমাদের প্রকাশিত বইপুস্তক পূর্বের চাইতে বেশি পরিমাণে বিতরণ করা হয়। দূর দূরান্তে সাধারণ জনগণের কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া উচিত যেন সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতের শিক্ষা ও বিশ্বাস ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করুন যেন তারা জামা'তের বইপুস্তক ক্রয় করেন আর পড়েন এবং তাদের পরিচিতদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করেন।

একইভাবে বর্তমান যুগে, আহমদীয়াতের বাণীকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে জামা'তের বিভিন্ন অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। সকল আহমদীকে MTA এবং অন্যান্য জামা'তী প্লাটফর্ম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অনলাইন তথ্যভাণ্ডার দেখতে এবং শেয়ার করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। আলাহ্‌র অশেষ কৃপায়, প্রতি বছর, হাজার হাজার মানুষ গঞঅএবং alislam.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে পরিচিত হচ্ছে। তাদের মাঝে অনেক পবিত্রচেতা এবং পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করছে। অতএব MTA-কে কেবল আহমদীদের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ চ্যানেল ভাববেন না বরং এটিও তবলীগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। তথাপি, জামা'তের বাইরের দর্শকদের নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে এটি এখনও এর পুরো সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে না। আর তাই প্রত্যেক শূরার সদস্য এবং পদাধিকারীর MTA এবং alislam.org-এর ন্যায় আমাদের অন্যান্য সাইট ও প্লাটফর্মকে অ-আহমদী এবং অমুসলিমদের কাছে পরিচিত করতে জোর প্রয়াস ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শূরার সদস্য এবং জামা'তের পদাধিকারী হিসেবে যদি আত্মত্যাগ এবং বিনয়ের সাথে আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন এবং সিজদাবনত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র করুণা লাভের জন্য দোয়া করেন, তবে অবশ্যই জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও আশিস পূর্বাপেক্ষা বহুল ধারায় বর্ষিত হবে। উপরন্তু, আপনারাও অপরাপর আহমদীদের নতুন উদ্যম নিয়ে ইসলামের বাণী প্রচারের কাজে অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হবেন, ইনশাআল্লাহ্। বর্তমানে কিছু বিরুদ্ধবাদী আপত্তি করে থাকে, আহমদীরা মুখে এক কথা বলে আর করে ভিন্ন কিছু। তারা বলে, আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এসব আপত্তির কোন ভিত্তি নেই, কিন্তু এটি আমাদের জন্য সাবধানবাণীও বটে। আমাদের নিশ্চিৎ করতে হবে যে, কখনওই যেন আমাদের কথা এবং কাজের মাঝে সামান্যতম স্ববিরোধ বা অসামঞ্জস্য না থাকে আর আমাদের সকল কাজ যেন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হয়।

অবশ্যই, আজ যেখানে বিশ্বে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার লেশমাত্র দেখতে পাই না, সেখানে মুক্তির একমাত্র পথ এবং যে ধ্বংসের দিকে মানবজাতি ধাবমান, তা থেকে রক্ষার একমাত্র পথ হল, মানবজাতির তার স্রষ্টাকে চেনা এবং তাঁর সামনে মাথা নত করা। এক্ষেত্রে আমাদেরকেই সামনের কাতারে থাকতে হবে এবং নিজ নিজ দেশের জনগণকে জাগ্রত করতে হবে এবং তাদেরকে খোদা তা'লার অধিকার এবং একে অপরের পারস্পরিক অধিকার প্রদানের মৌলিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত করতে হবে। কিন্তু, আমাদের পক্ষে এটি ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব না যতক্ষণ আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.) এবং এ যুগে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর শিক্ষা ও মূল্যবোধকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করব।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে চেষ্টা করা উচিত, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী পৌঁছে দেয়া উচিত, যেন তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। কেবল তখনই এটা বলা যাবে, আমরা 'মজলিসে শূরা' প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করছি। খলীফাতুল মসীহ্ জামা'তকে এমন পথে পরিচালিত করতে চান যার মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হবে। আপনারা যদি এমনটি করেন, কেবল তবেই আপনারা প্রকৃত অর্থে যুগ খলীফার একনিষ্ঠ সাহায্যকারী হিসেবে কর্মরত বলে গণ্য হবেন। কেননা বিশ্বজুড়ে জামা'তের সকল সদস্য যুগ খলীফার হাতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ দল হিসেবে ইসলাম তথা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত ও চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক বিজয়ের দিকে সমান তালে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আপনারা নিজেদের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন বলে বলা যাবে।

আর তাই আমি আশা করি এবং দোয়া করি, আপনারা যে আলোচনাই করেছেন আর আমার কাছে যেসব সুপারিশই পেশ করবেন তা সকল ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করে থাকবেন এবং এ গভীর বাসনা নিয়ে করে থাকবেন যে, আমাদের জামা'তের মধ্যে একতার বন্ধন যেন এক নতুন মার্গে উন্নীত হয় এবং বিশ্বের সকল স্থানে ইসলামের প্রকৃত বাণীকে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই কথাগুলো বলার পর, আমার দোয়া থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা মজলিসে শূরার দ্বিতীয় শতাব্দীকে আশিসমণ্ডিত করুন। আমাদের জামা'ত চিরকাল ঐশী কল্যাণধারায় সিক্ত থাকবে ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুরস্কাররাজি লাভ করতে থাকবে, এটিই আমার কাম্য।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 18 Aug, 2022 Issue No. 33

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১ম পাতার শেষাংশ.....

অতএব, কাউকে খোদার পুত্র বা স্ত্রী বা তাঁর অংশীদার হিসেবে আখ্যায়িত করা ন্যায়সম্মত কাজ নয়,বরং তা অন্যায়। কেননা একজনের অধিকার অন্য কাউকে দেওয়াকেই অন্যায় বলা হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে নিজের দিকে আরোপিত করাও ন্যায়ের পরিপন্থী। যেমন শরিয়ত বিধান তৈরী করা এবং ঐশী ইলহাম প্রেরণ করা খোদা তা'লার কাজ। এখন যদি কোনও ব্যক্তি নিজেই শরিয়ত রচনা করার বা ইলহাম নাযেল করার দাবিদার সেজে বসে, যেমন বাহাউল্লাহ্র মত ব্যক্তিরা করেছে; সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি ন্যায়কে উল্লঙ্ঘন করে। মানুষ যদি খোদা তা'লার প্রতি ন্যায় করে তবে শিরক, কুফর এবং অবাধ্যতা- এগুলি সব নির্মূল হবে।

'আদল' বা ন্যায়ের থেকে উচ্চতর মর্যাদা হল 'এহসান' (উপকার সাধন)। এহসানের অর্থ অন্যরা আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে তা উপেক্ষা করা বরং সে যদি অন্যায় করে, তবুও আমরা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করব। এই মর্যাদাটি প্রথমোক্ত মর্যাদার চেয়ে উচ্চতর। আর ক্ষমা করা, দরিদ্রদের সাহায্য করা, দান-খয়রাত করা এবং জাতির সেবা ইত্যাদি পুণ্যকর্মগুলি এর অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞান বৃদ্ধি এবং আহরণের জন্য চেষ্টা করাও এর মধ্যে পড়ে, কেননা এর পরিণামে আপন ও পর সকলের আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উপকার ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়।

তৃতীয় মর্যাদাটি হল 'ইতাইযিল কুরবা'-র, (আত্মীয়-স্বজনদের দান করা) যার অর্থ আত্মীয়স্বজনদের দেওয়া। এর এই আয়াতের অর্থ হল মানবজাতির প্রতি এমন আচরণ কর যেমন একজন আত্মীয় অপর এক আত্মীয়ের প্রতি করে থাকে।

এই আচরণ দ্বারা 'এহসান'-এর আচরণকে বোঝানো হয় নি। কেননা 'এহসান' (উপকার সাধন)-এর উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এই আচরণ বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সহজাত ভালবাসাকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোনও রকম প্রতিদানের লাভের বাসনা ও প্রত্যাশা ছাড়াই। 'এহসান' করার সময় মানুষ চিন্তা করে যে অমুক ব্যক্তি তার প্রতি ভাল আচরণ করেছে, আমি তার প্রতিদান হিসেবে আরও ভাল আচরণ করব যাতে আমার সুনাম হয়। কিম্বা কোনও পাপীর পাপ ক্ষমা করার সময় এই চিন্তা মাথায় আসে আমি তার প্রতি 'এহসান' করলে তার মনের বিদ্বেষ দূরীভূত হবে আর সে আমার বন্ধুতে পরিণত হয়ে আমার শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে। কিন্তু মা যে তার সন্তানকে ভালবাসে, তার জন্য ত্যাগস্বীকার করে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিদান লাভের বাসনা থাকে না, বরং তার ভালবাসা টিকে থাকে তার নিজেরই ত্যাগস্বীকারের উপর ভিত্তি করে। কোনও মহিলার যদি সন্তান না হয়,তবে তার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হয় না যে আমার ছেলে থাকলে আমার সেবা করত। বরং সেই বাসনার পিছনে এই আবেগ ও অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে যে সে তার সন্তানের লালন পালন করত, সেবাযত্ন করত,তাকে কাপড় পরাতো,তার বিয়ে দিত, তার সন্তানদের খাওয়াতো। মোটকথা সন্তান লাভের বাসনা করার সময় মায়ের মনে সন্তানের সেবা লাভের বিন্দুমাত্র অনুভূতিও থাকে না,বরং সেই বাসনার উৎপত্তি হয় সন্তানের সেবাযত্ন করার সাধ থেকে। এটিই সেই পুণ্যকর্মের স্পৃহা যা মানুষের জন্য সব থেকে বড় পুণ্য আর যা অর্জনের পর মানুষের নৈতিক অস্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'এহসান'এর মর্যাদা লাভের পর, মানুষ যখন পাওয়ার চাইতে দেওয়ার জন্য বেশি উন্মুখ হয়ে থাকে, সেই পুণ্যের মর্যাদা অর্জন কর যখন কিনা সমগ্র মানবজাতি নিজ সন্তানের মত মনে হবে আর তাদের সেবার জন্য তোমার হৃদয় উদ্বেল হবে যেভাবে মায়ের হৃদয় নিজ সন্তানের প্রতি ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও বিনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের মোকাবেলায় তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই ফলপ্রসূ হবে না।"

(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১ইং)

৮এর পাতার পর....

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন এমন সদস্যও রয়েছে যারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করে না। তাই আবশ্যকীয় এ কর্তব্যের দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করানো প্রয়োজন।

হুযূর আকদাস বলেন, যারা নামায আদায় করে না, তাদের সন্তানদের ওপরও এমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যে, তাদের সন্তানেরা নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না বা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না, এই কারণে যে, তারা তাদের পিতা-মাতাকে দেখে শিখেছে।

পবিত্র কুরআন পাঠের বিষয়টির ওপর প্রত্যাবর্তন করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন: "পবিত্র কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করানো আপনার দায়িত্ব। যদি আমরা নিয়মিত পবিত্র কুরআন পাঠ না করি তাহলে কীভাবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হব? অতএব আমাদের কাজ বারবার মানুষকে স্মরণ করানো। এই কাজের জন্যই সেক্রেটারি তালিমুল কুরআন রয়েছেন। অতএব আপনাকে আপনার কাজ অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভালবাসার সাথে এ দিকে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাদের স্মরণ করাতে থাকুন। বারবার তাদেরকে বলুন এবং পবিত্র কুরআন এই নির্দেশই প্রদান করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'যাক্কির', যার অর্থ মানুষকে স্মরণ করাতে এবং উপদেশ প্রদান করতে থাক।"

উক্ত বিষয়টির ওপর প্রচেষ্টার লক্ষ্যে হুযূর আকদাস, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে সংযুক্ত করার কথা বলেন। যখন একবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা হবে তখন সেটি বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে।

অন্য একজন আমেলা সদস্য উল্লেখ করেন, যখন সন্তানরা ১৫ বছর বা আরো বড় হয়ে যায়, তখন পিতামাতার কথা শোনার ব্যাপারে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের আগ্রহে ভাটা পড়ে। তিনি হুযূর আকদাসের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন: "মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-র এ বিষয়টি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এ বয়সে যুবকরা সমাজে অনেক বেশি স্বাধীনতা লাভ করে এবং তারা ঘরের বাইরে বন্ধুদের সাথে বেশি সময় কাটায়। তাদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্ব স্ব অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখার জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-র সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। একইভাবে, যুবকদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আমাদের কমকর্তাগণের নিত্যনতুন ও আকর্ষণীয় কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা উচিত। তরুণ সদস্যদেরকেই জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন বা কী ধরণের কার্যক্রম পছন্দ করে। এগুলো নিয়ে নিজেদেরে মাঝে আলোচনা করুন এবং সেইভাবে পরিকল্পনা নিন ও কার্যক্রম প্রণয়ন করুন যেন তারা মসজিদে আসতে আগ্রহবোধ করে।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত একজন আহমদী ও ওয়াকফে নও হিসেবে তাদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী খুব ভালভাবে শিখানো উচিত যেন যখন তারা ১৫বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বাবলী ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত থাকে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন: "ছোটবেলা থেকেই কীভাবে সন্তানদেরকে সংযুক্ত করবেন তা অবশ্যই আপনাকে মূল্যায়ন করতে হবে। আপনাদের সঙ্গে তাদেরকে এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যেন তারা খুব সহজেই আপনার ডাকে সাড়া দেয়। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্কে রূপকভাবে বলা হয়েছে, তিনি যেন তার সঙ্গে পাখিদের সংযুক্ত করেন এবং যখন তিনি তাদের ডাক দিবেন, পাখিরা তার কাছে দ্রুত ছুটে আসবে। অতএব সন্তানদেরকে আপনাদের সঙ্গেএতটা সংযুক্ত ও আপনাদের প্রতি অনুরাগী করুন যেন তারা একইভাবে আপনার ডাকে চলে আসে।"

সন্তানদের প্রতিপালন সংক্রান্ত অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকদাস, ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন: "আমি লক্ষ্য করেছি যেসব শিশুদের মাঝে ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলা হয়েছে, সেসব শিশুরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় থেকেছে। যখন তাদের নৈতিক প্রতিপালন এভাবে করা হয় না, তখন তারা এতটা দৃঢ় হয়ে ওঠে না। অতএব আমাদের জামা'তের অঙ্গসংগঠন ও পিতামাতা উভয়ের ওপরই এ দায়িত্ব বর্তায়।"

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir